মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

সাত যুবকের গল্প

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
অনূদিত

মাকতাবাতুল আখতার
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

সাত যুবকের গল্প

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۝

তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম, আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম; তারা যখন ওঠে দাঁড়াল তখন বলল, আমাদের প্রতিপালক! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক! আমরা কখনোই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন মাবুদকে ডাকব না; যদি করে বসি তাহলে সেটা খুবই গর্হিত হবে। [কাহাফ : ১৭ : ১৩-১৪]

সূরা কাহ্ফের যে আয়াত দুটি উদ্ধৃত করেছি সেই আলোকে এবং আধুনিককালের স্টাইলে যদি বলি তাহলে আজকের আলোচনার নাম দিতে পারি– 'সাত যুবকের গল্প।' আমি মনে করি, আল-কুরআনে বর্ণিত এই গল্পে মানব জাতির তরুণ সমাজের জন্যে এক মহান পয়গাম নিহিত রয়েছে। এই ঘটনা তাদের জন্যে এক উন্নত মডেল। চেতনার অবিনাশী উৎস। সকল কালের তরুণদের জন্যেই সমান উপযোগী এই ঘটনা। শুধু মন ও বিশ্বাসই নয় বরং যোগ্যতা, সাহস, স্বপ্ন ও সংকল্প নির্মাণেও এই ঘটনা সমান কার্যকর। কখনও বা এই গল্প পাঠে হৃদয়ে প্রশান্তির শিশির ঝরে, কখনও বা বর্ষিত হয় তরতাজা পুষ্পবৃষ্টি, কখনও বা হৃদয়ে জ্বলে ওঠে দৃঢ় অঙ্গীকার। আমি আজকের যুবসমাজকে সেই গল্পই শোনাতে চাই। আমি শোনাচ্ছি না। শোনাচ্ছে আল কুরআন নিজে। আর তারা ছিল এত ভাগ্যবান, কুরআন তাদের গল্প শুনিয়ে তাদেরকে শাশ্বত ও চিরন্তন মর্যাদায় ভূষিত করেছে। সকল কালের সকল তরুণদের জন্যে তাদেরকে নির্বাচন করেছে অনুসরণীয় 'মডেল' হিসাবে। ঘটনার বর্ণনা খুবই সরল ও সংক্ষিপ্ত। অথচ খুবই গভীর এবং শিক্ষণীয়।

গল্পটি হলো এই, রোমান সুপার পাওয়ার শাসিত একটি অঞ্চল। যাকে শাম ও ফিলিস্তিন বলা হয়। এই অঞ্চলেই একটি দাওয়াত সৃষ্টি হলো। যার বাহক সায়্যিদুনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। আমরা মুসলমানরাও যাঁকে আল্লাহর নবী হিসাবে মানি ও শ্রদ্ধা করি। তিনি আবির্ভূত হলেন। তাওহীদের প্রতি জানালেন উদাত্ত আহ্বান। অথচ খোদার দুনিয়াটা তখন শিরক ও কুফুরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অন্ধকারের মধ্যেই তিনি আলোর চেরাগ হাতে ওঠে দাঁড়ালেন। শিরক, বংশপূজা, রুসুম-রেওয়াজের অন্ধ অনুকরণ, সংশয়বাদ, ক্ষমতার দাপট আর মানবতা বিরোধী সকল তৎপরতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন। তাঁর এই দাওয়াতের ভিত্তি তাওহীদ ও নিরেট আল্লাহর দাসত্ব। কেউ কেউ তাঁর এই দাওয়াতকে মেনে নিল। তারা নিজেরাও শরীক হয়ে পড়লো মহান এই তাওহীদি মিছিলে। তারা তাওহীদের এই আলোকিত পয়গাম নিয়ে নিজেদের অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এলো। রোমকদের শাসনকেন্দ্রের কাছে গিয়ে এই দাওয়াত তুলে ধরলো।

এটা বাস্তব, সাধারণত পরিপক্ব বয়স ও অভিজ্ঞতায় যারা পুষ্ট হন তাদের পা প্রচলিত রেওয়াজ, অভিজ্ঞতার আবেদন, ভয় ও সম্ভাবনার অদৃশ্য শেকলে বাঁধা থাকে। ফলে তারা অভিজ্ঞতার নতুন সীমানায় পা দিতে যেমন ভয় পায় তেমনি নবতর আহবে ঝাঁপিয়ে পড়তেও দ্বিধা বোধ করে। থমকে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ওই অদৃশ্য শেকলমুক্ত তরুণ সমাজ সহজেই পারে যে কোন সংস্কারের ডাকে সাড়া দিতে, নতুন সীমান্তের পথে পা বাড়াতে। যৌবন ও তারুণ্য এভাবেই এগিয়ে যায় নতুনের পথে।

এখানে কুরআনে কারীম চিহ্নিত করেনি, এই যুবকদের বয়স কত ছিল। আর এটাই কুরআনের বৈশিষ্ট্য। কারণ, কুরআন যদি নির্দিষ্ট করে বলতো, তাদের বয়স ছিল ১৮-২০ বছর– তাহলে এর নীচের ও উপরের বয়সীরা বলতো, এটা আমাদের গল্প নয়। তাই কুরআন বলেছে : তারা কয়েকজন যুবক ছিল। [إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ] যারা আরবী ভাষার স্বভাব ও চরিত্রের সাথে পরিচিত তারা জানেন, আরবী 'ফিত্‌য়াতুন' শব্দটি বয়সের তারুণ্যের পাশাপাশি মন মেজায সাহস উদ্যম সংকল্প ও স্বপ্নের তারুণ্যের প্রতিও ইঙ্গিত করে। উর্দু ভাষায় তাই এর তরজমা করা হয় 'জাওয়াঁ মর্দ'। [বাঙলায় সম্ভবত এর উপযুক্ত শব্দ হতে পারে তরুণ] সেই সাথে এখানে 'ফিত্‌য়াতুন' শব্দটি যেহেতু আরবী ভাষার ব্যাবকরণ মতে [جمع قلت] জমা' কিল্লতের জন্যে ব্যবহৃত হয় তাই এর অর্থ দাঁড়ায়– অল্প ক'জন তরুণ! আর এটাই সর্বকালের বাস্তবতা। যখনই সত্য সুন্দর ও সংশোধনের কোন দাওয়াত এসেছে তো সূচনাতে খুব সামান্যজনই তা গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে তাওফিক দিয়েছেন তারাই যুগে যুগে এই সাহস করেছেন।

এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর সুন্দরতম নামাবলীর মধ্য থেকে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ করেছেন : إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ তারা ছিল কয়েকজন তরুণ– তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল। এখানে 'রব' শব্দটি গভীর অর্থবহ। কারণ, শাসকরা নিজেদেরকে প্রজাদের রিযিকদাতাও মনে করে। কখনও বা এ কথা মুখে বলে, আবার কখনও তা তাদের কাজেকর্মে ফুটে ওঠে। ফলে, শাসিতের ভেতরও এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়, তারা ভাবে সম্মানের সাথে বাঁচতে হলে, সুখ-ভোগের

ভেতর জীবনযাপন করতে হলে শাসক শ্রেণীর সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাদের তল্পি বহন করতে হবে। তাদের আঁকা ছকের ভেতর থেকেই জীবনযাপন করতে হবে। তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাতে হবে। কারণ, এর বাইরে গেলে সুখভোগ ও মর্যাদার জীবন ব্যাহত হবে। জীবন হয়ে পড়বে দুর্বিষহ।

কুরআনে কারীমের অলৌকিকতা এটাই। কুরআন যেখানে যে শব্দ চয়ন করেছে সেটাই সেখানকার জন্যে যথার্থ। শব্দের এই একটি চয়নমাত্রার কারণে এক শব্দ পুরো এক গ্রন্থের মর্ম বর্ণনা করতে পারে। এই যুবকরা গিয়ে সেই ময়দানে দাঁড়াল যেখানে রোমান শাসনের পাতাকা উড়ছিল। এই রোমান শাসনই ছিল তৎকালীন পৃথিবীর সবচে' সুশৃঙ্খল সভ্য উন্নত ও আইন প্রণেতা দেশ। এই শাসন ব্যবস্থাও পৃথিবীর এক বিশাল অঞ্চলব্যাপী দর্পের সাথে রাজত্ব করছিল। সমকালীন এই মহাশক্তিধর পাওয়ারের একেবারে নাকের নীচে, চোখের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক'জন তরুণ একত্ববাদের এই নতুন দাওয়াতকে গ্রহণ করছে এবং তার দাওয়াত দিচ্ছে। আর এটাই ছিল তখনকার সত্য দীন, যথার্থ ইসলাম। কারণ, তখনও খৃষ্টধর্ম বিকৃত হয়নি। হযরত ঈসা (আ.)-এর পয়গাম ও দাওয়াতের যথার্থ পতাকাবাহীগণ সেখানে পৌছেছিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে জানালেন : এই শাসকরা আমাদের রিযিকদাতা নয়। আমাদের লালন-পালন করার ক্ষমতাও তাদের নেই। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনিই আমাদের রিযিকদাতা, তিনিই পালনকর্তা।

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুই আমাদের প্রভু।

জীবনোপকরণের দণ্ড যাদের হাতে, প্রতিষ্ঠিত সেই সরকারের সামনেই, সেই দেশেই এই বাণী উচ্চারণ করা হলো। বাহ্যত যে শাসকরা ছিল সে দেশের জনতার ভাগ্য ও রিযিকের অধিপতি। মানুষের ক্ষতি ও উপকার সাধনের সব শক্তিই বাহ্যত তাদের হাতেই সমর্পিত ছিল। অবস্থা এমন ছিল, শাসকদের সাথে সম্পর্ক নির্মাণ ও তাদের প্রতি আত্মসমর্পণই তখন বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তবদর্শিতা মনে করা হতো। পুরো সমর্পণ না করলেও নীরবতা ও মৌনতার সাথে জীবন পার করে দেয়াটাই ছিল দৃশ্যত

যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। কিন্তু তারা ধরলেন বিপরীত পথ। তারা গ্রিক ও রোমান দেবতাদেরকে অস্বীকার করে বসলেন। অথচ সমকালীন গ্রিক ও রোম সভ্যতা সংস্কৃতি ও জীবনবোধ ছিল এসব দেবতাবিশ্বাসে পূর্ণ আচ্ছন্ন। শুধু গ্রিক আর রোমই কেন, প্রাচীন ভারতও ছিল এই একই ব্যাধির শিকার। সংশয়বাদে সমর্পিত ছিল সবাই। আল্লাহ তাআলার অনুপম গুণাবলীকে তারা দেবতার আকৃতিতে ভাবতো। তাদের নামে ভজনালয় ও ইবাদতখানা নির্মাণ করতো। বলতো, এটা ভালোবাসার দেবতা, এটা করুণার দেবতা, যুদ্ধজয়ের দেবতা এটা আর ওটা হলো ভয় ও প্রভাব সৃষ্টির দেবতা। বৃষ্টি ও শান্তির দেবতাও ছিল স্বতন্ত্র। কিন্তু ভাগ্যবান ও সত্যদর্শী এই যুবকদল একবাক্যে অস্বীকার করে বসল এ সকল দেবতাকে। তারা বলল :

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ۝ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝

তারা বলল : আমাদের প্রতিপালক আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক। তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন মাবুদকে আমরা ডাকবো না। যদি ডাকি তাহলে তা হবে খুবই গর্হিত। আমাদের সম্প্রদায়ের এই লোকেরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছে। (আচ্ছা, এরা যে তাদের প্রভু ও মাবুদ) এ বিষয়ে তারা স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে না কেন? যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাদের চাইতে জঘন্য অবিচারী আর কে আছে? [কাহ্ফ : ১৪-১৫]

এখানে পবিত্র কুরআন আরেকটি তত্ত্ব তুলে ধরেছে। তা হলো, প্রথম উদ্যোগ মানুষকেই নিতে হয়। মানুষকেই প্রথমে সসাহসে অগ্রসর হতে হয়। তারপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য অবতীর্ণ হয়। ইরশাদ হয়েছে–

آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى۝

তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর আমি তাদের হেদায়াতকে বৃদ্ধি করে দিয়েছি।

এতে এ কথাই প্রতিভাত হয়, যদি কোন ব্যক্তি অপেক্ষায় থাকে কোন কথা কিংবা বিশ্বাস নিজে নিজেই তার অন্তরে স্থান করে নিবে অথবা বিনা সাধনাতেই তার কণ্ঠে শোভিত হবে– তাহলে তার এই ধারণা হবে ভুল ও অবাস্তব। সত্য হলো, প্রথমে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারপর সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহর সাহায্য আসবে সচেষ্ট হবার পর। আল্লাহ বলেছেন–

وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

আমি তাদের অন্তরগুলোকে আশ্রয় দিয়েছি, ভরসা দিয়েছি।

কারণ, তাদের লড়াইটা ছিল সমকালীন সর্বোচ্চ শক্তির সাথে। তারা সরকারী ধর্ম উপেক্ষা করে আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করেছিল।

এ হলো আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা। ১৯৭৩ ঈ. সালের কথা। আমি সে বছর পূর্ব উরদুনে সফরে গেলে ঐতিহাসিক সেই গুহাটি দেখার সুযোগ পাই। যে গুহায় সেই ভাগ্যবান ঈমানদার যুবকগণ ঘুমিয়ে আছেন। উরদুনে প্রত্নতত্ত্বের গবেষক আমার আন্তরিক সফরসঙ্গী ড. রফীক অফা আদ-দাজ্জানী আমাকে গুহাটি দেখান। একাডেমিক বৈজ্ঞানিক নানা তত্ত্ব-তথ্যে তিনি প্রমাণ করলেন এটাই আসহাবে কাহ্ফের গুহা। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইকতিশাফুল কাহ্ফ ও আসহাবুল কাহ্ফ' দেখা যেতে পারে। ইতিহাস প্রমাণ করে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ঘটনা ছিল এ অঞ্চলের কবিতার প্রাণ। সাহিত্যের অনিবার্য অঙ্গ ছিল ঈমানদীপ্ত এই কাহিনী। আমি আমার 'মা'রাকায়ে ঈমান ওয়া মাদ্দিয়্যাত' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনা করেছি।

ঐতিহাসিক সূত্র মতে ঈমানদার এই তরুণদের অধিকাংশই ছিল রাজ দরবারীদের সন্তান। রাজ দরবারের নিমকসিক্ত ছিল তারা সকলেই। কারও বাবা, কারও বড় ভাই ছিল সমকালীন রোমান আম্পায়ারের পদস্থ ব্যক্তি।

যে কারণে বিষয়টি আরও নাজুক ও জটিল রূপ ধারণ করেছিল। যদি সমাজের ছিন্নমূল কিংবা গুরুত্বহীন অতি সাধারণ পরিবারের কিছু তরুণ এমন একটি বিদ্রোহের শ্লোগান দিত; রাজ-খান্দান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একদল যুবক যদি এই ঘোষণা দিত, আমরা সরকারী ধর্ম মানি না। আমরা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছি– তাহলে বিষয়টি অত জটিল হতো না। অথচ বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের এই বিদ্রোহ পুরো খান্দান, খান্দানের ভাগ্য ও সম্মানকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। খান্দানের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, তাদের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন।

তাদেরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা যেত, তোমরা তোমাদের সন্তানদের এই বিদ্রোহী পদক্ষেপে বাধা দাওনি কেন? তাছাড়া ওসব খান্দানের মুরুব্বীদের জন্যে বড় সংকট এও ছিল, এই তরুণদের প্রতি তাদের আস্থা ছিল প্রচুর। তাদের নিয়ে আশা ও স্বপ্নেরও অন্ত ছিল না অভিভাবকদের। সন্তানদের এই বিদ্রোহী উচ্চারণ তাদেরকে কঠিন পরীক্ষার মুখে দাঁড় করিয়েছিল– বলতে হবে। কুরআনে কারীমের এক জায়গায় আশার প্রদীপ সন্তানের প্রথাবিরোধী বিদ্রোহ অভিভাবককে কতটা হতাশ, ক্লান্ত, কাতর করে তুলে তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে। হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম ছিলেন সামূদ সম্প্রদায়ের আশার প্রদীপ। তিনিই যখন তাঁর জাতিকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানালেন, সত্য দীনের দাওয়াত দিলেন তখন তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ হতাশায় বিমূঢ় হলেন। আঘাতে চুরমার অন্তরে তারা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে বললেন : সালেহ! তোমাকে নিয়ে তো আমাদের ভবিষ্যত স্বপ্নের অন্ত ছিল না। আশা ছিল তুমি আমাদেরই পথে সরল গতিতে এগিয়ে যাবে। তোমাদের কল্যাণে আমাদেরই পূর্ণ বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এতে করে খান্দানের নাম উঁচু হবে। আমরাও গর্ব করব তোমাকে নিয়ে। কুরআনের ভাষায়–

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا۝

তারা বললেন : সালেহ! ইতোপূর্বে তুমি তো আমাদের মাঝে ছিলে আশার প্রদীপ।

কিন্তু তুমি আমাদের আশার গুড়ে বালি ঢেলে দিলে। এক দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে। পুরো জাতিকে তোমার প্রতিপক্ষ করে তুললে। আরবী ভাষার এই 'মারজু' শব্দটির কাছাকাছি শব্দই হলো ইংরেজির Promising শব্দ। উজ্জ্বল ভবিষ্যতে আশাবাদী কোন তরুণ বা শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

জাগ্রত এই যুবকরা সংখ্যায় বেশি ছিল না। বিভিন্ন নিদর্শন যুক্তি ও অনুমান বলে তাদের সংখ্যা সাতের উর্ধ্বে ছিল না। তবে বাস্তবতা হলো, এই সাত জনের সাথে কয়েকশ' মানুষের ভাগ্য জড়িত ছিল। তাদের প্রত্যেকের সাথেই বিশাল গোষ্ঠী ও খান্দান সম্পৃক্ত ছিল। তাদের এই প্রতিকূল পদক্ষেপ তাদের সকলকেই আশংকার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তাদেরকে অন্যরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে।

এই যুবকরা কত খান্দানের স্বপ্নের ভরসা ছিল। তাদেরকে নিয়ে খান্দানের লোকেরা স্বপ্ন দেখতো। কল্পনার জাল বুনতো। তাদের ভবিষ্যত উন্নতি ও সুদিন নির্ভরশীল ছিল এই যুবকদের উপর। এ বিষয়টা হয়তো অনেকেই ভেবে দেখে না। তারা ভাবে, সাত আটজন যুবকের বিষয়। এটা এমন কী ঘটনা? ধরা পড়লে পড়ল! মারা গেলে গেল! জীবন সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হলো তো সাতজন ব্যক্তিই হলো! তারা বিষয়টি এভাবে ভাবে না, বিষয়টি একক ব্যক্তি বিশেষের নয়। তাছাড়া কালচারড্ জীবনে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন চিন্তায় 'ব্যক্তি' চিন্তার অবকাশ নেই। সমাজ সমষ্টি থেকে আলাদা করে কবিরা হয়তো ভাবতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সাধারণত একক ব্যক্তি চিন্তা বলতে কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতিটি ব্যক্তির সাথেই এখানে অসংখ্য ব্যক্তি সম্পৃক্ত। অনেক ক্ষেত্রে একই অস্তিত্বের মত।

যদি এই সাতজন বিদ্রোহ করে বসতেন তাহলে হয়তো সত্তরটি খান্দান সংঘাতে অবতীর্ণ হতো। তাই বিষয়টি ছিল খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত এবং স্পর্শকাতর। এ কারণেই উপমা হিসাবে কুরআনে কারীমে এই ঘটনাটি উদ্ধৃত হয়েছে। বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে এই ব্যাখ্যা নেই, সংকটপূর্ণ এই মুহূর্তে তাদেরকে কীভাবে শাসানো হয়েছিল। ধমকানো হয়েছিল কীভাবে। আর কীভাবেই বা লোভ দেখানো হয়েছিল। কারণ, সভ্যতার

রেওয়াজ ও নিয়ম এটাই। বিশেষ করে তরুণ শ্রেণী যখন বেঁকে বসে তখন তাদেরকে হুমকি-ধমকির পাশাপাশি লোভের মুলাও দেখানো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুমকি-ধমকিতে তরুণরা পড়ে না। তারা বশ মানে লোভের মুলার সামনে। এক বুযুর্গ। তিনি প্রতিপক্ষের ধমক ও ধন উভয় প্রস্তাবেরই মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন– ধমকের চাইতে ধনের ফাঁদই বেশি কঠিন। তাই শাসক ও শক্তিধররা উভয় পথেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সচেষ্ট হয়। হয়তো এই যুবকদের সামনে ধমক ও আঘাতের বাধা এসেছিল। তারা তা প্রতিহত করেছেন। হয়তো বা ধনের প্রলোভনও এসেছিল। তারা তাও প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে শক্তি ও শান্তি দান করেছিলেন। তাদের অন্তরকে উৎসর্গ ও বিসর্জনের শক্তিতে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

কোন দেশ ও জাতি তখনই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় যখন কিছু মানুষ তাদের ভবিষ্যতের কথা ভুলে যায়। এই সম্প্রদায়টি কিন্তু নির্বোধ কিংবা অপ্রকৃতস্থ (ABNORMAL) হয় না। এই যুবকদের কথাই ধরা যাক, তাদের কথাবার্তা থেকেই বুঝা যায়, তারা সুস্থ অনুভূতি, সজাগ বিবেক ও চৌকস যুবক ছিল। হ্যাঁ, এ কথাও প্রতিভাত হয়, শুধু পেটের ডাকে এক টুকরো রুটি আর গতর ঢাকার জন্যে এক টুকরো কাপড়ে তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এই তুচ্ছ প্রাপ্তিতে তাদের আত্মা ও রুহ্ তুষ্ট হতে পারেনি। তারা ভেবেছে, এ তো একজন বিত্তবানের কুকুরও নিয়মিত পায়। ধনবান আমীর-জমিদারদের কুকুরও অনেক সময় এত মূল্যবান খাঁটি দুধ পায় যা গরীবের ঘরের সন্তানরাও পায় না। এই পালিত কুকুর অনেক ক্ষেত্রে এমন সুখভোগে লালিত হয় আশরাফুল মাখলুকাত অনেক মানুষও যা অনেক সময় স্বপ্নে-কল্পনাও করতে পারে না। অথচ ভাষাতীত আয়েশে লালিত সেই কুকুর অবলীলায় জীবন বিলিয়ে দেয় নিঃস্ব রিক্ত অভুক্ত সেই বান্দার তরে– যে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, হৃদয়ে যার আসন পেতেছে ঈমান। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে স্বজাতি মানবের প্রতি দরদ দিয়েছেন। মানবতার মুক্তি ভাবনা দিয়েছেন তাকে। তাই সে সিদ্ধান্ত করে নেয়, তুচ্ছ বাড়ি বানানোর জন্যে নয় আমার এ জীবন। বন্য জানোয়ারের মত খানাপিনা হতে পারে না আমার জীবনের লক্ষ্য। ভুল বিশ্বাস, ভ্রান্ত লক্ষ্য, ভণ্ডকর্ম ও পাপী চরিত্রের শংকা থেকে আমাকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে

হবে আমার সমাজ জাতি ও ভবিষ্যতকে। ভুল পথ কর্ম চিন্তা ও চরিত্রের প্রতি যারা অন্ধবিশ্বাসে ঝুঁকে আছে তাদেরকে তুলে আনতে হবে সঠিক পথে।

মানবতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যাঁরা সাহসের সাথে এ পথে অবতীর্ণ হয় তারা সফলকাম হয়। নিজের সুখভোগ, স্বপ্ন-সাধ বিলিয়ে দিয়ে তাঁরা পুরো জাতিকে বাঁচিয়ে তোলে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে। তাদের হাতেই রক্ষিত হয় মানবতার সম্ভ্রম। দেশ ও জাতির শান্তি নিরাপত্তা সংশোধন সফলতা সত্য ও সততার পয়গাম দাওয়াত ও তার ধারাবাহিকতা তাঁদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়, টিকে থাকে যুগে যুগে।

এখন আমরা দীনি ঈমানী মানসিক চারিত্রিক সকল ক্ষেত্রেই চরম সংকট (CRISIS)-এর শিকার। বিশেষ করে চারিত্রিক পতন স্খলন ও লয় এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে মহামারির মতো। দায়িত্বানুভূতি, কর্মতৎপরতা, সততাপূর্ণ চেষ্টা-সাধনা, দেশের প্রতি ভক্তি ও প্রেম, স্বদেশীদের প্রতি মমত্ববোধ এখন সোনার হরিণ। প্রশাসনের দিকে দেখুন– মনে হবে প্রতিটি ব্যক্তি শুধু তার পকেট ভারি করার নেশায় চেয়ার পেতে বসে আছে। তার সামনে একজন মানুষ এসে যখন বসে তখন সে শ্যানদৃষ্টিতে তাকায়– কত নেয়া যাবে এর কাছ থেকে? অথচ চোখ তুলে তাকায় না আগত লোকটির মুখে বেদনার কী ছাপ জ্বলজ্বল করছে। লোকটির ব্যথা-বেদনার মর্মান্তিক মর্ম সে বুঝতে চায় না। তার বিপদের গভীরতা উপলব্ধি করতে চায় না। বরং বাজের দৃষ্টিতে তাকায় তার STANDARD OF LIVING- তার মাত্রা চিহ্নিত করার জন্যে। এর ফল এই দাঁড়ায়, একজন নাগরিক দীর্ঘদিন বিদেশ করে যখন দেশে ফিরে তখন তার ভেতরে দেশে ফেরার আনন্দের চাইতে অনেক বেশি ভয় ও আতংক থাকে এই ভেবে– কী জানি কোন ঝামেলায় পড়ি, কত টাকা ঘুষ দিতে হয়! তার অন্তরজুড়ে দুর্ভাবনার ঝড়। ঘরে ফেরার আনন্দ নেই। এই অবস্থা বড়ই বেদনাদায়ক।

আমি এ কথা বলছি না, কলেজ-ইউনিভার্সিটি ছেড়ে আপনারা সমাজের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ুন। কারণ, উত্তম সেবার জন্যে প্রথমে উত্তমরূপে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। খ্যাতিপূর্ণ শিক্ষাজীবনই আপনার পরবর্তী জীবনকে আরো অধিক স্বাতন্ত্রমণ্ডিত করে তুলবে। আমি বরং বলতে চাই, আপনারা

ভালো কাজের প্রতি মনোযোগী হন। দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করুন নিজেদের ভেতর। দেশপ্রেমে নিজেকে বলিষ্ঠ করে তুলুন। আপনি যদি মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে নিজেকে 'সত্যিকারের মুসলমান' হিসেবে গড়ে তুলুন। কর্ম প্রেরণা আপনার ভেতর এমন থাকা চাই– আরাম করলে আপনার ভেতর সুখ অনুভূত হবে না, সুখ অনুভূত হবে কাজ করতে পারলে। জীবনের সকল শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে। সর্বত্রই সংকট। কোনটা বলব?

সবিশেষ আমি আমার মুসলমান তরুণদেরকে বলব, সততা সত্যবাদিতা কর্তব্যপরায়ণতা তোমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। সমাজে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করতে হলে তোমাদেরকে অবশ্যই এসব গুণের অনুশীলন করতে হবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈনের জীবন ও আদর্শই হবে তোমাদের পথ চলার পাথেয়। নিজের স্বপ্ন ও ভবিষ্যতকে আশংকায় ফেলে হলেও স্বীয় দেশ ও জাতির মুক্তির কথা তোমাদেরকেই ভাবতে হবে। কবি আকবর মরহুম বলেছেন–

কালের চালেই চলবে যদি
এতে কী আর গর্ব আছে!
যুগের গতি দেয় ঘুরিয়ে
গর্ব তো ভাই তাকেই সাজে।♣

ইসলাম : একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা

দুটি বিশ্বাস দুটি সভ্যতা

আমরা বিশ্বাস করি, মহান আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করার লক্ষ্যে, আকল ও বিবেকের উর্ধ্বে অবস্থিত, অনুপম অতুলনীয় তাঁর পাক সত্তাকে মানব জাতির সামনে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে নবী-রাসূলগণের সুমহান ধারাকে নির্বাচন করেছেন। প্রথমে তাঁর কলেমা ও পয়গামের মাধ্যমে তাদেরকে তাঁর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলেছেন। অতঃপর তাদের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য সকল মানুষকে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সত্যজ্ঞান দান করেছেন। তারপর তাঁর মর্জি ও সন্তুষ্টি মাফিক জীবনযাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরই মাধ্যমে। এ মর্মে ইরশাদ করেছেন–

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللهَ
لِيَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ۝

তোমাদের 'গায়েব' সম্পর্কে অবহিত করবেন এটা আল্লাহর পদ্ধতি নয়। তবে আল্লাহ তাআলা (গায়েব বর্ণনা করার জন্য) তদীয় রাসূলগণের মধ্যে যাকে খুশি নির্বাচন করেন।' [আলে-ইমরান : ১৭৯]

আল্লাহ তাআলার মহিমময় সত্তা, তাঁর অনুপম গুণাবলী, তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর যথার্থ পদ্ধতি, তাঁর সন্তুষ্টি মাফিক জীবন পরিচালনার পথ জানতে হলে মহান এই জামাতের মাধ্যমেই জানতে হবে। তাঁদের শিক্ষা ও নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে অন্য কোনো উপায়ে মহান মনিবের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পথ আবিষ্কার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বিবেক মেধা অনুমান অভিজ্ঞতা খায়েশ স্বপ্ন আর সামাজিক রীতি-প্রথার অনুসরণ এখানে অর্থহীন। এখানে একটাই পথ। এই বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকেই জানতে হবে কোনটা তাঁর সন্তুষ্টি ও মর্জি অর্জনের পথ। আর এটা শুধু নবীগণের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। কিয়ামতাবধি মানব জাতির পথপ্রদর্শন, শুদ্ধ সফল জীবনের যথার্থ নির্দেশনা, ইবাদত-বন্দেগীর গ্রহণযোগ্যতা, জীবনের সফলতা ও উৎকর্ষ সাধন সবই পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীল মহান এই কাফেলার অনুসরণের ওপর।

তাঁদেরই শেখানো আকিদা-বিশ্বাস, তাঁদেরই দেয়া প্রভু-পরিচিতি, তাঁদের মাধ্যমে আনীত অর্জিত হাকীকত তত্ত্ব চিন্তা পথ জীবন সভ্যতা চরিত্রই শুধু মহান আল্লাহর প্রিয়। বিশ্বের সকল শ্রেণীর সকল কালের মানুষকে শুধু তাঁদেরই অনুকরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মহান মালিকের পক্ষ থেকে। তাঁদের জীবন ও শিক্ষাকেই একমাত্র নমুনা ও মডেল হিসেবে নির্বাচন করেছেন তিনি। পবিত্র কুরআনের এক স্থানে আল্লাহ তাআলা মহান এই কাফেলার কথা এভাবে স্মরণ করেছেন–

تِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ط نَرْفَعُ
دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ۝ وَوَهَبْنَا
لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ
قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ
وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ
۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِّنَ
الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ
وَلُوْطًا ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَمِنْ

اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۝ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝

এ ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ প্রদর্শন করেছি– তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ সুলাইমান আইউব ইউসুফ মুসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও যাকারিয়া ইয়াহইয়া এবং ইল্‌য়াসকে। তাঁরা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইসরাঈল ইয়াসা ইউনুস ও লূতকে। তাঁদের প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের ওপর গৌরবান্বিত করেছি। আরও কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে। আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। এটি আল্লাহর হেদায়াত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথে চালান। যদি তারা শিরক করতো তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেতো। তাদেরকেই আমি গ্রন্থ শরীয়ত ও নবুওয়াত দান করেছি। অতএব, যদি এরা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে তবে এর জন্য এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না [আনআম : ৮৩-৯০]

হৃদয়গ্রাহী প্রাণকাড়া প্রীতি ও মধুময় এই আলোচনার প্রতিটি শব্দ থেকেই যেন সমতা হৃদ্যতা ও কোমলতা ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে প্রাণের পিঠে। অতঃপর তিনি তাঁর নবীকে সম্বোধন করে পৃথিবীর সকল মানুষকে বলেছেন–

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۝

এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাঁদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো বিনিময় চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশমাত্র। [আনআম : ৯১]

এটা হলো মহান আল্লাহর প্রিয়তম মানব কাফেলা। তাঁদের প্রতিটি কথা ও কর্মই ছিল আল্লাহর প্রিয়। আল্লাহকেন্দ্রিক আকিদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে তাদের অভ্যাস পছন্দ চরিত্র আচরণ সভ্যতা রীতিনীতি চালচলন সবই তাঁর প্রিয়। আর তাঁদের আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র-সভ্যতা ও জীবন পদ্ধতির নামই ইসলাম। পক্ষান্তরে এর বিপরীত মেরুতে অবস্থিত জীবন ও সভ্যতাকেই বলা হয় জাহেলিয়্যাত মূর্খতা।

ইবরাহীমি কাল

নবী-রাসূলগণের এই কাফেলার মধ্যে সায়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে প্রিয় বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁকে মানব জাতির ইমাম ও পথ প্রদর্শনের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তাঁরই সন্তানদের মাঝে নবুওয়তের সিলসিলা চালু করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝

আর আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমকে স্বীয় একনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। [সূরা : নিসা : ১২৫]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন–

قَالَ إِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۝

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম পথপ্রদর্শক বানাবো। [সূরা : বাকারা : ১২৪]

অন্য এক স্থানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য অনন্য চরিত্র, আল্লাহ বিশ্বাসীদের ইমাম ও পথপ্রদর্শনের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে তাঁরই জীবন পথের অনুসরণ করতে সবিশেষ তাগিদ করেছেন এভাবে–

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا ط وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ط اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۝ وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَإِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক। সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই অনুগত এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। আমি তাঁকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছি এবং তিনি পরকালেও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইবরাহীমের দীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [সূরা : নাহল : ১২০-১২৩]

নবুওয়ত প্রাপ্তির পর থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন তাঁর কালের ইমাম পথপ্রদর্শক ও আদর্শ। তাঁর এই কাল কিয়ামত পর্যন্ত বহমান। এই

ইবরাহীমি কালের সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এই কালের সর্বশেষ উম্মত হলো মুসলমান। আর মুসলমানদের লক্ষ্য করেই স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

তিনি তোমাদের পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের কর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন। [সূরা : হজ : ৭৮]

ইমাম ও পথপ্রদর্শক হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মর্যাদা তাঁর দাওয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নির্ভেজাল তাওহীদ এবং শিরক ও মূর্তিপূজাসহ সব কাল্পনিক বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা ও জ্বলন্ত প্রতিবাদ। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর কালের মুশরিকদের যে ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন তার বিবরণ পাক কুরআনে বিধৃত হয়েছে এভাবে–

إِنَّا بُرَاٰؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ ۝

তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা থাকবে। [মুমতাহিনা : ৪]

স্বীয় সন্তানদের সম্পর্কে তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা ও সাধ ঝরে পড়েছে এই ভাষায়–

وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রেখো। [ইবরাহীম : ৩৫]

নবুওয়তে মুহাম্মদী

ইবরাহিমী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে প্রেরণও করেছেন আরব ভূখণ্ডে মক্কা নগরীতে। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন সেই কাবার শহরে, যে কাবা নির্মাণ করেছিলেন তাঁর সম্মানিত দাদা হযরত ইবরাহীম (আ.)। সেই কাবার দেশে জন্মেছেন তিনি কিয়ামত পর্যন্ত যে কাবা হবে হিদায়াত তাওহীদ ও একত্ববাদের কেন্দ্রভূমি। সত্য আলো ও একত্ববাদের যে মহান ধারাবাহিকতার সূচনা করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পূর্ণাঙ্গতা ঘটেছে এসে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে এবং সেই সত্যদীন পূর্ণতায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁরই অপার সাধনায়। নির্দিষ্ট হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন হিসেবে। পরিপূর্ণ এই দীন ও সভ্যতা পৃথিবীর প্রতিটি কোণ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। তিনিই সর্বশেষ নবী, তাঁর মাধ্যমেই ইলাহী নেয়ামত লাভ করেছে পূর্ণতা। এখন পৃথিবীর জন্য পথপ্রাপ্তি, হেদায়াত লাভ ও উভয় জাহানের সফলতা পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করে একমাত্র তাঁরই অনুকরণের ওপর। তাঁর ইন্তিকালের প্রায় তিন মাস পূর্বে আরাফার ময়দানে পবিত্র কুরআনের ভাষায় অবতীর্ণ হয়—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۝

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম; আমার নেয়ামতকে তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে নির্বাচন করলাম। [সূরা : মাইদা : ৩]

আজ যদি কেউ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত দীন ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করে; তাঁর জীবন ও আদর্শকে বরণ করে; তাঁর পছন্দের

সভ্যতা ও জীবনধারাকে লুফে নেয়; তাঁর চরিত্র ও প্রশংসিত আখলাকের আলোকে স্বীয় জীবনকে গড়ে তুলতে পারে, তাহলে সে পরম প্রিয় প্রভুর প্রিয়পাত্রই হবে না, সে লাভ করবে তার চাইতেও অধিক কিছু। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۝

আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন; তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিবেন। [আলে-ইমরান : ৩১]

ইসলামী শরীয়ত ও ইবরাহিমী সভ্যতা

এখন এই পৃথিবীকে একটুখানি হেদায়াত, প্রভুর একটু সন্তুষ্টি ও সম্পর্ক পেতে হলে হযরত ইবরাহীম (আ.) কিংবা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই অনুসরণ করতে হবে। চিন্তা বিশ্বাস ও আকিদা গ্রহণ করতে হবে তাঁদের নির্দেশনার আলোকেই। আল্লাহর পবিত্র সত্তা, তাঁর অনুপম গুণাবলীকে উপলব্ধি করতে হবে তাঁদের শিক্ষার আলোকেই। তাঁদের শিক্ষা ও নির্দেশনাই চূড়ান্ত মাপকাঠি। তাঁরা যে চরিত্র রীতিনীতি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনবোধে বিশ্বাসী ছিলেন সেটাই আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য। তাঁদের জীবনে আচরিত চিন্তা শখ পছন্দই পরম প্রভুর দরবারে একমাত্র গ্রহণযোগ্য চিন্তা শখ ও পছন্দ।

তারা জীবনে যে কর্ম ও পথকে গ্রহণ করেছেন করুণাময় প্রভু সে পথ ও কর্মকেই হেদায়াতপ্রাপ্ত সুপথের যাত্রী সফল ও আদর্শ মানুষদের পথ ও কর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। সে পথের প্রতি, সে কর্মের প্রতি স্বভাব-শুদ্ধজনেরা সদাই আকৃষ্ট ছিল এবং আছে। হাদীসের ভাষায় একে 'স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য' আর ইসলামের পরিভাষায় 'সুন্নত' শব্দে স্মরণ করা হয়েছে।

মানুষের উভয় হাত আল্লাহরই সৃষ্টি। তারপরও বাম হাতের তুলনায় ডান হাত শ্রেষ্ঠ কেন? মঙ্গলময় ও সৎকর্মে কেন ডান হাতকে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে? এটা এই কারণেই, সুন্দর সৎ ও কল্যাণার্থে ডান হাত ব্যবহার করা সম্মানিত নবীগণের বরকতপূর্ণ অভ্যাস, ইবরাহিমী ও মুহাম্মদী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ইসলামী জীবন সভ্যতায় যেসব বিষয়কে সুন্নত ও মুস্তাহাব বলা হয়েছে এবং ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়, অনুসন্ধান করা হয় তাহলে এটাই প্রতিভাত হবে, এসব বিষয় নবীগণের বৈশিষ্ট্য ও ইবরাহিমী সভ্যতার পরিচায়ক।

এখানে বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার লক্ষ্যে আমি একটি ক্ষুদ্র উপমা দিলাম মাত্র। অবশ্য ইবরাহিমী সভ্যতার রয়েছে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। স্বতন্ত্র রূপ ও পরিচয়। তার স্বভাব, তার পছন্দ-অপছন্দ, তার রূপ-প্রকৃতি সবই অন্যান্য সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্বতন্ত্র ও সুবিদিত। এ বিষয়ে বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমি এখানে উল্লেখযোগ্য দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি। এ দুটি বৈশিষ্ট্য সচরাচর সবখানেই নজরে পড়ে। বিষয়টি উপলব্ধি করাও সহজ।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, উজ্জ্বল-বিধৌত কাপড় পরা, এটা পৃথিবীর সকল সভ্যতা ও সকল সভ্য মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর ইসলামী ইবরাহিমী সভ্যতায়ও এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী সভ্যতায় এটাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়, কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা শব্দ আছে তাহারাত- পবিত্রতা। এই নাযাফাত ও তাহারাত বা পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আমার মনে হয়, পবিত্রতার ধারণা কেবলই ইবরাহিমী ও মুহাম্মদী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এবং এ বিষয়টি যতটা সেনসেটিভ, ইসলামে তার গুরুত্ব যতটা উচ্চতর ও তাৎপর্যপূর্ণ আমার জানা মতে একমাত্র ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী জীবনাদর্শের বাইরে আর কোথাও এর নমুনা পাওয়া যায় না। শরীর ও বস্ত্রের পবিত্রতা, নাপাক থেকে পবিত্রতা অর্জন, ইসলামে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রস্রাবের বিন্দু-ছিটে লাগা মাত্রই তা ধুয়ে নিতে হয়। সামান্য অপবিত্রতার আঁচড় নিয়ে মুসলমান নামায পড়তে পারে না। এমনকি এই বিন্দু বিন্দু নাপাকের পরশকেও মেনে নিতে পারে না। চাই তার কাপড় দুধের মতো

পরিষ্কারই হোক না কেন। শরীর তার স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো হলেও মনে এক চরম অস্বস্তি বোধ করে। সে ভাবে, আমাকে পবিত্র হতে হবে। এক্ষুণি! খানাপিনা, আসবাবপত্র, বিছানা-পাটি সকল কিছুর বিধানও অনুরূপ।

পাক-নাপাক পবিত্র-অপবিত্রের এই বিরল চিন্তা ও বিধান শুধুই ইবরাহিমী ও মুহাম্মদী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়ার ক্ষেত্রেও এই পবিত্রতার বিধান কার্যকর। পৃথিবীর অন্যান্য বিধান ও আইন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গোশ্‌তের ক্ষেত্রেও ইসলাম হালাল-হারামের দেয়াল তৈরি করেছে। ইসলামে হারাম গোশ্‌ত গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা গেছে, যারা সুস্থ স্বভাব ও পরিচ্ছন্ন রুচির অধিকারী তারা ওই হালালের প্রতিই বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে। আর হারাম ও নাজায়েযের প্রতি বোধ করে গভীর ঘৃণা ও অস্বস্তি। ইসলামী সভ্যতায় প্রাণীর গোশ্‌ত হালাল হতে হলে তা বিসমিল্লাহ বলে জবাই করতে হবে। করলে হালাল ও পবিত্র। অন্যথায় হারাম ও অপবিত্র। পৃথিবীর অন্য কোনো জীবন সভ্যতায় এই ব্যবধানটুকু অবর্তমান।

শাশ্বত নেতৃত্ব ও বিশ্বজনীন দাওয়াত

শাশ্বত নেতৃত্ব বিশ্বজনীন দাওয়াত ও অবিনশ্বরতার শানে অমর হয়ে থাকবেন হযরত ইবরাহীম (আ.)– এ ছিল মহান আল্লাহর ফয়সালা। তিনি তাঁরই বংশে নবুওয়াত বুযুর্গী ও দীনি দিক-দর্শনের অমেয় সম্পদ ও সম্মান গচ্ছিত রেখেছেন। তাই তাঁর বংশের প্রতিটি সদস্য এবং তাঁর খান্দানের প্রতিটি অতিথিরও স্থির কর্তব্য হলো, সত্যের জন্য সংগ্রাম, অন্যায়ের প্রতিরোধ, আল্লাহর দীনের প্রতি দাওয়াত, অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় মানবতার পথনির্দেশে অসীম সংগ্রামে নিজেকে সঁপে দেওয়া। অথৈ তরঙ্গময় দরিয়ায় মানবতার বৈতরণীর কাণ্ডারী তাঁরাই। সত্যের দীপ যেন নিভে না যায়, সে দায়িত্ব তাঁদেরই। এটাই প্রধান ও নির্মাণমুখী প্রেরণা। এই প্রেরণাই মানবতার বিজয় রক্ষা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রধান ভিত্তি। আর এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) যে দাওয়াত ও আহ্বান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর সমাজে আমাদেরকেও একই পয়গাম ও বাণী

নিয়ে অবতীর্ণ হতে হবে আমাদের সমাজে। কারণ, এই ডাক দাবি ও দাওয়াতকেই আল্লাহ তাআলা অনন্তকালের জন্য সফল শাশ্বত চূড়ান্ত দাবি পয়গাম ও দাওয়াত হিসেবে কবুল করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

> এবং এই বাণীই তিনি (ইবরাহীম) তাঁর পরবর্তীদের মাঝে রেখে গেছেন– যাতে তারা আল্লাহমুখী থাকেন। [যুখরাফ : ২৮]

এ হলো ইবরাহিমী ও মুহাম্মদী দাওয়াত। এই দাওয়াত মূর্তিপূজা ও শিরকের বিপক্ষে। এর সাথে কোনোরূপ পূজাপাট কিংবা অংশীদারিত্বের বন্ধন নেই। এখানে ছোট বড় কোনো ধরনের পূজা কিংবা শিরকের এক বিন্দু সুযোগ নেই। পৃথিবীর সকল মানুষ জাতি ও গোষ্ঠীর প্রতি সর্বশেষ ও চূড়ান্ত উপদেশ এটাই।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۝

> অতএব তোমরা মূর্তিপূজার ক্লেদ থেকে নিজেদের রক্ষা করো; রক্ষা করো মিথ্যা বচন থেকে। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত থেকে– তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। [হজ : ৩০-৩১]

শাশ্বত ও বিশ্বজনীন এই দাওয়াতে বিত্তপূজা, পার্থিব এই ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি মোহ লিপ্সা, বস্তুপ্রেম এবং ক্ষমতা ও পদ লাভের কোনো আঁচড় নেই। রবং মহান এই দাওয়াতের অবিনশ্বর বৈশিষ্ট্য হলো–

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

> এই পরকালীন নিবাস আমি কেবল তাদেরকে দিই যারা পার্থিব জগতে বড় হতে চায় না এবং বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে

> না। আর উত্তম পরিণাম তো আল্লাহভীরুদের জন্যই। [কাসাস : ৮৩]

মহান এই দাওয়াতে মানুষ মানুষের মাঝে কিংবা দেশ দেশের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। বর্ণ-বংশের ফারাক এখানে অবান্তর। এই দাওয়াতে পক্ষপাতিত্ব কিংবা ত্রাসের সুযোগ নেই। বর্ণ বংশ ভাষা কালচার ও অঞ্চলের আদলে কোনো মানুষকে বিচার করার, শ্রদ্ধা কিংবা ঘৃণা করার, তার জীবন ও সম্ভ্রমকে মাপ-জোখ করার অবকাশ নেই। এখানে অবিচার অত্যাচার ও শোষণের সুযোগ নেই কারও জন্যেই। কারও প্রতি অবিচার ও নির্দয়তা বর্বরতার স্মারক। জেদ ও ক্ষোভের নিন্দায় ইরশাদ হয়েছে–

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ۝

> কেননা, কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতা যুগের জেদ পোষণ করতো। [ফাতহ : ২৬]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ۝

> আমার পর তোমরা কাফের হয়ে পড় না যে, একে অপরের গর্দান মটকাতে থাকবে।

মহান এই দাওয়াতের যারা উত্তরাধিকারী তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। আর হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। কোনো আরব কোনো অনারবের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। কোনো আজমীও শ্রেষ্ঠ নয় কোনো আরবীর চাইতে। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হলো তাকওয়া আল্লাহর ভয়।

ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا

كُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۝

হে মানবগোষ্ঠী! আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে আল্লাহকে বেশি ভয় পায়। [হুজুরাত : ১৩]

সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনোরূপ সাম্প্রদায়িকতার দাবি করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার জন্য লড়াই করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [আবু দাউদ শরীফ]

একবারের ঘটনা। কোনো এক প্রসঙ্গে আবেগাপ্লুত সাহাবায়ে কেরাম আনসার ও মুহাজিরগণের নামে শ্লোগান দিলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এসব ছাড়! এগুলো খুবই নিচ কথা।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই দাওয়াতের ভিত্তি তাওহীদ। সমাজ জীবনের ভিত্তি হলো মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা, সমতা; চরিত্রের ক্ষেত্রে মহান এই দাওয়াতের ভিত্তি হলো, তাকওয়া, লজ্জা ও বিনয়; আমলের ক্ষেত্রে ভিত্তি হলো পরকাল চিন্তা জিহাদ ও বিসর্জন। জিহাদও হবে পরম বীরত্ব, পূর্ণ প্রীতি ও অসহায় নিরপরাধজনদের প্রতি গভীর মমতার সাথে। শাসন ব্যবস্থায় মানুষকে কল্যাণ পথ নির্দেশনাকেই সম্পদ সঞ্চয় ও সংগ্রহের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেবা গ্রহণের চাইতে সেবা প্রদান এবং অন্যের দ্বারা উপকৃত হওয়ার চাইতে অন্যকে উপকার করার দিকটাই এখানে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

সভ্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ কায়দায় মানবতার সংরক্ষণ ও লালন, মূর্খতার আক্রমণ ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে মানবতাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে মহান এই দাওয়াত এক উজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী। পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে আছে মহান এই দাওয়াতের সুন্দর সুষমামণ্ডিত অসংখ্য নিদর্শন। মহান এই দাওয়াতের বরকতপূর্ণ রসে আপ্লুত বিশাল এই পৃথিবী।

বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য

আমাদের মাঝে একটি বন্ধন আছে মাটির। এটা বাস্তব ও অকাট্য। আমাদের অন্তরে এই বন্ধনের মর্যাদাও অনেক। এই বন্ধনকে আমরা ভালোও বাসি। ইসলামও এটাকে অস্বীকার করে না। ইসলাম এই বন্ধনকে ছিন্ন করার আদেশও দেয়নি। মাটির এই বন্ধন পবিত্র কুরআনে স্বীকৃতি পেয়েছে এই ভাষায়– 'মিনহা খালাকনাকুম...' তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি...। আমরা বার্মিজ, ভারতী, তুর্কি। এ সবই এই মাটির পরিচয়। মাটির পরিচয়েই কেউ সাইয়েদ, কেউ মোগল, কেউ পাঠান। কিন্তু ঈমান ও চরিত্রের বিচারে আমরা ইবরাহিমী, মুহাম্মদী। মন মেধা ও চিন্তায় আমরা মুসলমান।

আমাদের এই ঈমান বিশ্বাস চরিত্র ও চিন্তার পরিচয়কে তুলে ধরতে হবে। আমাদেরকে বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করতে হবে। ঈমান আখলাক মনন ও চিন্তায় আমরা ইবরাহিমী ও মুহাম্মদী। মহামূল্যবান এই বিচারে আমি শুধুই মুসলমান।

আমি মুসলমান। চাই আমি ভারতে থাকি আর পাকিস্তানে। আমি ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক হই আর মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিক হই, আমি ইবরাহিমী, আমি মুহাম্মদী। এই বিচারে সারা পৃথিবীতে আমরা স্বতন্ত্র, ভিন্ন। এক নতুন পরিবারের সদস্য আমরা। জাতি ও অঞ্চলভেদে আমাদের পরিচয় যত ভিন্ন ও বিচিত্রই হোক না কেন, আমরা পরস্পরে এক। আমি আমেরিকান মুসলমান; আমি মালয়েশিয়ান মুসলমান; আমি বার্মার মুসলমান; আমি ভারতের মুসলমান, আমি জায়ারের মুসলমান। আমাদের সকলের সভ্যতা এক, সংস্কৃতি অভিন্ন।

হতে পারে আমাদের পোশাক বিচিত্র। এই যেমন ভারতীয়রা শেরোয়ানি পরে। অথচ অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখে না আমাদের এই পোশাকটি। আর ইসলামও পোশাকের রঙ, স্টাইল ও ধরনের ক্ষেত্রে ছক বেঁধে দেয়নি। আম্বিয়ায়ে কেরামও বিশেষ কোনো পোশাক পরতে সকলকে আদেশ করেননি। আর এ কারণেই যদি পৃথিবীর কোথাও কোনো বিশ্ব মুসলিম সমাবেশ হয়, তাহলে বিচিত্র রঙ, ডিজাইন ও ধরনের এক উদার দৃশ্য নজরে পড়বে। কিন্তু পোশাকের এই ভিন্নতা

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে নয়। বরং এ হলো ইসলাম অনুমোদিত এক বিচিত্ররূপ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমানা রয়েছে। সেই সীমানার ভেতর থেকেই প্রদর্শিত হয় এই বৈচিত্র।

ইবরাহিমী ও মুহাম্মদী সভ্যতার মূল মর্ম

উল্লিখিত হুদূদ ও সীমানাটাই হলো ইবরাহিমী সভ্যতা এবং মুহাম্মদী তাহ্‌যিব। আর এ কারণেই এই সভ্যতা পৃথিবীব্যাপী ব্যাপ্ত। এই সীমানার মাঝে রয়েছে বিশাল স্বাধীনতা। জীবন চলার বিশাল উদার ও ব্যাপক প্রান্তর এখানে। একজন স্বভাবজাত ভদ্র ও সভ্য মানুষ এখানে জীবনযাপন করতে পারে নদীর পানির মতো সরল ও সহজভাবে। তবে সীমানার ভেতরে থাকতে হয় অবশ্যই। পুরুষ রেশমি কাপড় পরিধান করবে না; নারী পর্দা-প্রাচীর ভাঙবে না; অপচয় ও কার্পণ্যকে স্থান দেবে না; লুঙ্গি হোক আর পায়জামা– টাখনোর নিচে নামতে দেবে না; আবার হাঁটুর উপরে উঠতে দেবে না; নির্লজ্জতা, অপব্যয় ও অহংকারকে এড়িয়ে যাবে সযত্নে। জীবন পথের এই বিশাল সীমানায় পৌছে একজন সভ্য-সুশীল-মুহায্‌যাব নাগরিক এক বৈচিত্রময় জীবন অনুভব করে। শত বৈচিত্রের মাঝেও স্বভাবজাত সকল বিভিন্নতার ভেতরেও সে প্রত্যক্ষ করে ইবরাহিমী সভ্যতার ঐক্য; লক্ষ্য করে মুহাম্মদী তাহ্‌যিবের অব্যক্ত বিকাশ।

সীমারেখা ও হুদুদের বিচারে যদি আমরা সভ্যতার ঐক্য দেখতে চাই তাহলে এর একটি সুন্দর উপমা আছে। উপমাটি সরল ও সর্বজনবিদিত। লক্ষ্য করলে দেখবেন– বার্মা, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানগণ ডান হাতে খানা খায়। ডান হাতের এই খাদ্যাভ্যাসে ভারত-বাংলাদেশের মুসলমানগণও এক। তারা সকল ভালো কাজই ডান হাতে করতে অভ্যস্ত। বাম হাতে কেবল সেসব কাজই করে থাকে যা মানুষের একান্ত প্রাকৃতিক কিংবা স্বভাবজাত। এগুলোই হলো নবী-রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা।

ইবরাহিমী সভ্যতা আর মুহাম্মদী তাহযিবের বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে সকল ক্ষেত্রেই একটা সীমানা আছে। দাম্পত্য জীবনের কিছু নিয়ম-নীতি আছে। সামাজিক লেনদেনের নির্ধারিত নীতিমালা আছে। সেসব রীতি ও নিয়মের ভেতর থেকে আমরা যা খুশি খেতে পারি যা খুশি পান করতে পারি।

সীমানার ভেতরে কোনো সংকীর্ণতা নেই। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, কেউ কারও পোশাক আহার কিংবা পথ ও পন্থা নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করতে পারবে না। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে–

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۝

হে মুমিনগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এই ধরনের কাজ থেকে তাওবা করে না তারাই অবিচারী। [হুজুরাত : ১১]

দেশপ্রেম ও ইবরাহিমী-মুহাম্মদী সভ্যতা

আমাদেরকে অবশ্যই মাতৃভূমির উন্নতি নির্মাণ ও অগ্রগতি সাধনে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে নির্মাণমুখী কর্মকাণ্ডে প্রতিযোগিতা করতে হবে। যোগ্যতা সততা প্রশাসনিক দক্ষতা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, চারিত্রিক উৎকর্ষ ও আন্তরিকতায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। দেশ নির্মাণে আমাদেরকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন জাতি আমাদের অবদানকে অনুভব করতে পারে। তারা যেন আমাদের অস্তিত্বকে দেশ ও জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক মনে করতে বাধ্য হয়। আমাদের উপস্থিতিকে যেন তারা বরকত নীতি ও শান্তির প্রতীক মনে করে।

আমরা যে রাষ্ট্রে বসবাস করব সে দেশের ভাষার প্রতিও আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে। শুধু পড়লেই হবে না। মাতৃভাষায় রীতিমতো কবি-

সাহিত্যিকের মর্যাদা অর্জন করতে হবে। চেষ্টা-সাধনা এমন হতে হবে যেন আমাদের ভাষা-সাহিত্যকে বিচারের মাপকাঠি মনে করা হয়। রচনা ও সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার অধিকারী হতে হবে আমাদেরকে।

আমরা যে কোনো ভাষাতেই চাইলে সাহিত্য-মান অর্জন করতে পারি। এক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা ইসলামে নেই। তবে ইবরাহিমী সভ্যতা আর মুহাম্মদী তাহযিব বলেছে, মিথ্যা বলতে পারবে না। সত্য বলতে হবে, সত্য লিখতে হবে। লেখাটা ডান দিক থেকে হলো না বাম দিক থেকে সেটা বিচার্য নয়। কিন্তু সততা, ইনসাফ, আদর্শ ও কল্যাণের পক্ষেই লিখতে হবে। মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা, পাপ অবিচার ও অন্ধত্বকে উৎসাহিত করে; মানবতাকে কলংকিত ও বিক্ষত করে, মানব সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে আর নির্লজ্জতা ও পাশবিকতাকে চাঙ্গা করে তোলে এমন রচনা ও সাহিত্য সাধনার অবকাশ নেই। আরবী হরফেও না, ফার্সি হরফে না। আর যদি অবিচার অন্ধত্ব ধোকা প্রতারণার বিরুদ্ধে ইংরেজি হরফেও লেখা হয় সেটাই কাম্য প্রশংসিত ও প্রার্থনীয়; বরং সেটাই হবে মহান প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।

আরবী ব্যতীত অন্য সব ভাষাই সমান

আরবী ইসলামী শরীয়তের সরকারী ভাষা। আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আরবীতেই নামায পড়ি আমরা। এর বাইরে এই পৃথিবীতে যত ভাষা আছে সবই সমান। এটা ভিন্ন কথা, ডান দিক থেকে লেখা হয় যেসব ভাষা সে ভাষাতে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের এক বিরাট ভাণ্ডার সংরক্ষিত হয়ে আছে। কারণ, ডান দিক থেকে সূচিত হয় যেসব ভাষা সেসব ভাষায় এমন অনেক সন্তানের জন্ম হয়েছে যারা দীর্ঘকালব্যাপী ইসলামের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তারা তাদের ওই ডান দিকের ভাষায় মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার করেছেন। ইসলামী শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর এ কারণেই ওসব ভাষার প্রতি আমাদের দুর্বলতা আছে। আমরা ওসব ভাষাকে গুরুত্বের সাথে দেখি। আর এ কারণেই আমরা যারা ভারতে বাস করি তারা উর্দু ভাষার সংরক্ষণকে জরুরি মনে করি। মনে করি আমাদের আজকের বংশধররা যেন এই ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু এটা

ভাষার কৃতিত্ব নয়। তাই শুধুই ভাষার বিচারে কোনো ভাষাকে ভিন্ন করে দেখার অবকাশ নেই। হ্যাঁ, ইসলামী সভ্যতা আমাদেরকে এই নির্দেশ অবশ্যই দিয়েছে। আমরা ডান দিক থেকে লিখি আর বাম দিক থেকে মিথ্যা যেন না লিখি। ধোকা প্রতারণা আর অপবাদের কৃষ্ণ পাপ যেন আমার কলমে অংকিত না হয়। এটাই ইবরাহিমী সভ্যতা ও মুহাম্মদী তাহযিবের শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য। আর এই সভ্যতার দাওয়াত একটাই, আমাদের জীবন যেন রেঙে ওঠে মহান এই শিক্ষার রঙে।

আমরা যেখানেই থাকি সেখানেই এই ইবরাহিমী সভ্যতা ও মুহাম্মদী তাহযিবের পতাকাবাহী

এই বিশাল ভারত তো সভ্যতা-সংস্কৃতির এক লীলাভূমি। এখানে অসংখ্য দর্শন সভ্যতা ধর্ম ও রীতির বসবাস। পূর্বেও ছিল, আজো আছে। মুসলমানগণ হলেন ইবরাহিমী সভ্যতা ও মুহাম্মদী তাহযিবের পতাকাবাহী। সুতরাং এই পৃথিবীতে যে কোনো দেশে যে কোনো অঞ্চলে বসবাসের মূল লক্ষ্যই হলো এই সভ্যতার, এই সংস্কৃতির সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন। এই উম্মাহর, এই জাতির সংরক্ষণ অস্তিত্ব ও বিজয়ও পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল এই সভ্যতার অস্তিত্বের ওপর।

আমাদের এই ভারত বর্ষের অবস্থা হলো, এখানকার ধর্ম ও সভ্যতার সাথে মিশে গেছে অসংখ্য সভ্যতার রঙ ও নির্যাস। ফলে তাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র হারিয়ে গেছে। অথচ ইসলাম কতো দীর্ঘ পথ ও কাল অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু এখনও সে তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল। কারণ, ইসলামের পতাকাবাহীগণ কখনও নিজেদেরকে ইবরাহিমী সভ্যতা থেকে আলাদা করেনি; মুহাম্মদী তাহ্যিবের সাথে কৃত বন্ধনকে ছিন্ন করেনি। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা তাদের একত্ববাদের অবিনাশী মন্ত্রকে হাত ছাড়া হতে দেয়নি। রিসালাতের দীপ্ত চেরাগ থেকে মুহূর্তের জন্যে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি এবং এখনও তাদের অস্তিত্ব সেই অতীত বন্ধন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপরই নির্ভরশীল। তারা যদি তাদের এই সীমান্ত

রেখা (Line of Demarcation) ধরে রাখতে পারে কালের পিঠ থেকে কেউ তাদেরকে মুছে ফেলতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

মিল্লাতে ইবরাহিমী কারও ইজারা নয়

মিসর আরব ও মক্কার কুরাইশী, ইয়েমেনের যাইদী, মারাকাশের হাসানী, জাওয়া ও সুমাত্রার হাযারীদের মিল্লাতে ইবরাহিমী ও শরীয়তে মুহাম্মদীর ওপর যতটুকু হক রয়েছে ঠিক ততটুকুই হক রয়েছে ভারত পাকিস্তান মালয় ও আফগানের মুসলমানদের। এই অধিকার সমান এবং প্রতিষ্ঠিত। এই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। দুর্ভাগ্যবশত যে হাশেমী কুরাইশী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বন্ধন ছিন্ন করেছে, তার চাইতে সেই ব্রাহ্মণপুত্র হাজারগুণ শ্রেষ্ঠ যে সায়্যিদুনা ইবরাহীম (আ.) ও সায়্যিদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আত্মিক ঈমানী আখলাকি বিচার-বুদ্ধি ও সভ্যতার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেছে। একেই বলে–

کیا خوب کہا سنوی نے ایک روز شریف مکہ سے ،
تونام ونسب کا حجازی ہے، پردل کا حجازی بن نہ سکا

একদা সন্ন্যাসী কহিল ডাকি
শরীফ সভ্য মক্কী তুমি
বংশ গোত্রে হেজাযী জানি
হৃদয়ে হেজাযী নও।

সুতরাং যদি কোনো ভারতীয় হৃদয়ে বিশ্বাসে হেজাযী হয় তাহলে সে রক্ত-বংশের সেই হেজাযীর চাইতে হাজারগুণ শ্রেষ্ঠ যে তার মূর্খতাপূর্ণ আরব্য পরিচয়ে অহংকার করে বেড়ায়। যার হৃদয়ে ইবরাহিমী সভ্যতার কোনো ধন নেই, নেই মুহাম্মদী তাহযিবের কোনো আলো, অথচ আবু জেহেল ও আবু লাহাবের সন্তান হওয়ার সুবাদে সে গর্বিত।

আমাদের গর্বের ধন প্রাচ্যের মহাকবি ইকবাল ছিলেন এক নওমুসলিম খান্দানের বংশপ্রদীপ। তিনি এক সায়্যিদপুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

میں اصل کا خاص سومناتی ‏ ‏ آبا میرے لاتی ومناتی
تو سید ہاشمی کی اولاد ‏ ‏ میری کف خاک برہمن زاد
دیں مسلک زندگی کی تقویم ‏ ‏ دیں سر محمد وبراہیم
دل در سخن محمد بند ‏ ‏ اے پور علی زبوعلی چند؟

সোমনাথ আমার আদি নিবাস
বাপ-দাদা ছিলেন সবই পূজারী।
তুমি সায়্যিদ, হাশেমী সন্তান
আমি তুচ্ছ ব্রাহ্মণপ্রসূণ!
ইসলাম সে তো জীবন পথ
এ পথ ইবরাহীমের মুহাম্মদের (সা.)।
হৃদয়ে যদি না হও মুহাম্মদী
আলীর (রা.) পুত্র সে কোন ছার!?

ক্ষুদ্র বন্ধন

এই পার্থিব জীবনে যত বন্ধন আছে, আত্মীয়তা আছে সবই ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র নশ্বর। বরফের মতো কালের হাওয়ায় দ্রুত হারিয়ে যাবে এই বন্ধন, এই সম্পর্ক। হাশেমী, আরবী, ভারতীয়, পাকিস্তানী, মালয়, ইন্দোনেশীয় কোনো পরিচয়ই থাকবে না। থাকবে শুধু আল্লাহর নাম। থাকবে শুধুই আল্লাহর নামে নিবেদিত সাধনার নির্যাস। থাকবে আল্লাহর তরে সঞ্চিত নিষ্ঠাটুকু। বংশের বৈচিত্র্য, খান্দানের ছোট বড় ভেদাভেদ, সমাজের উঁচু-নীচুর ফারাক, সবই হারিয়ে যাবে। আল্লাহ ভালোবাসেন তাঁর দীনকে। দীন তাঁর কাছে খুবই প্রিয়। তিনি তাঁর তরে নিবেদিত এখলাস ও নিষ্ঠাকে ভালোবাসেন। ইবরাহীম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-সভ্যতা তাঁর প্রিয়। এই পৃথিবীর সব হারিয়ে যাবে। থাকবে শুধু তাঁর প্রিয় এই সভ্যতা।

আমাদের সিদ্ধান্ত

আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, আমরা আমাদের দেশে বসবাস করবো আমাদের আকিদা বিশ্বাস ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সাথে। আমরা যেখানেই থাকবো আমাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যেই থাকবো ভাস্বর হয়ে। আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে কোনো অবস্থায়ই হাত ছাড়া করবো না। দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এটা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ফয়সালাও। কিন্তু তাই বলে আমরা আমাদের প্রিয় বিশ্বাস, চেতনার স্বাতন্ত্র্য, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও সভ্যতার রূপ, ভাষা ও সংস্কৃতির নিজস্বতাকে বিসর্জন দেব তা তো নয়। কারণ, এই যদি হয় নাগরিকের মর্যাদা তাহলে তো এ দেশ আর আমাদের দেশ থাকবে না। তখন এটা হবে আমাদের কারাগার। পূর্ণ একটা জাতিকে সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে কারাগারের জীবনযাপনে বাধ্য করার মতো কারো অধিকার নেই। আমাদের জন্ম এই দেশে। এখানকার মাটি থেকেই নির্মিত আমাদের শরীর।

সুতরাং এই দেশ, এই মাটি আমাদের খুবই প্রিয়। তবে আমাদের সভ্যতা হলো ইবরাহিমী। মুসলমান পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, তার নাগরিকত্ব যাই হোক তার সভ্যতা ইবরাহিমী। সে যেখানেই থাকবে সেখানেই থাকবে স্বাধীন। দেশের নীতি ও অগ্রগতিতে সে থাকবে পূর্ণ অংশীদার। দেশের আইন সংস্কার, সংবিধান প্রণয়নেও তার অংশীদারিত্ব থাকবে পূর্ণ মর্যাদার সাথে। স্বদেশে বিদেশীদের মতো জীবনযাপন মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য নয়। স্বদেশে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকার এক স্বভাবজাত মানবিক ও আদর্শিক আইন। এই অধিকারকে যখনই দলিত করার চেষ্টা করা হয় এবং যেখানে– সেখানেই কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সত্য পরীক্ষিত।

জীবনেও ইসলাম মরণেও ইসলাম

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কাছে দাবি করেছেন, তারা যেন সর্বদাই ঈমান ও ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের জীবন চলার পথ যেন হয় শুধুই ইসলাম। মরণও যেন হয় ইসলামের ওপর। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۞

তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [আলে-ইমরান : ১০২]

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁদের সন্তানদেরকে জীবন-সন্ধ্যায় এই উপদেশই দিয়েছিলেন পূর্ণ গুরুত্বের সাথে। ইরশাদ হয়েছে–

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۞

এরই অসিয়ত করেছেন ইবরাহীম তাঁর সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [বাকারা : ১৩২]

ইসলাম একজন মুসলমানের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাপনের একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান দান করেছে। ইসলাম তার চারপাশে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছে যাতে করে সে সর্বদাই স্মরণ রাখতে পারে– এই দীন ও মিল্লাতের সাথে তার একটি বন্ধন রয়েছে। আর দীনের দাঈ ও প্রচারক ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এর প্রধান ভিত্তি হলো তাওহীদ ও একত্ববাদে বিশ্বাস। এ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনদর্শন। এই দর্শনে বিশ্বাসীরাও পৃথিবীতে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি।

একজন মুসলমান সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন প্রথমেই তার কানে আযান দেওয়া হয়। তার জন্য একটি ইসলামী নাম নির্বাচন করা হয়। নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব ও প্রশংসা বিকাশক নামকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তারপর তার ইবরাহিমী সুন্নত আদায় করা হয়। অতঃপর

যখন সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে তার জন্য দুআ করা হয়। দুআ করা হয় জীবিত-মৃত সকল মুসলমানের জন্যই এবং এভাবে–

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَ
فَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ۝

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে ইসলামের ওপর বাঁচিয়ে রেখ আর যাকে মৃত্যু দান করবে মৃত্যু দিও ঈমানের সাথে।

তারপর যখন তাকে কবরে রাখা হয়, শেষ ঠিকানায় শুইয়ে দেয়ার পর এই প্রার্থনাই গুঞ্জরিত হয়, 'বিস্মিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্।' আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীন মিল্লাতের ওপর রাখলাম।

এ সকল আয়োজন, নির্দেশ ও শিক্ষার মূল লক্ষ্য এটাই, আমরা যেন উঠতে বসতে, শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বদাই এ কথা মনে রাখি, আমি ইবরাহিমী মিল্লাতের একজন সদস্য, আমি উম্মতে মুহাম্মদীর একজন। আমার একটি জীবনপথ রয়েছে। আমি 'এক' আল্লাহর বান্দা। তাঁর অনুগত দাস আমি। সুনির্দিষ্ট এই আইন ও পথেই চালিত হবে আমার জীবন। জীবন-মৃত্যু সবই হবে এই পথে, এই বিধানের অনুসরণে। আমাদের বর্তমান বংশধররা এ পথেই এগিয়ে যাবে। আগামী বংশধররাও উঠে আসবে এ পথেই। এটাই সিরাতে মুস্তাকীম।

মিল্লাতে ইবরাহিমী আর দীনে মুহাম্মদীর এই দাওয়াত আজ স্পষ্ট করে দেওয়ার সময় এসেছে। কারণ, এটাই সেই মহান সভ্যতার দাওয়াত যার ভিত্তি রেখে ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। এর সংস্কার ও পূর্ণতা সাধন করেছেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সমাজ ও চরিত্রে এর কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি আছে। এসব নীতি সকলের সফলতা স্বাধীনতা ও সম্মানজনক জীবনের রক্ষাকবচ। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমন্বিত দাওয়াতের উত্তরাধিকার এই সভ্যতা এবং এটাই আল্লাহর দরবারে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন-সভ্যতা।

কঠিন আমানত

এখন, এই সময় মুসলিম উম্মাহ এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। পরীক্ষা তার ঈমানের, বিশ্বাসের, মেধার, শক্তি ও সামর্থ্যের। তাই এখন এই উম্মাহকে বহুমুখী এই পরীক্ষায় টিকে থাকার তরে সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম শুধু বেঁচে থাকার নয়। ঈমানের সাথে বেঁচে থাকার। সেই সাথে তাদেরকে এও প্রমাণ করতে হবে, আমরা যে দেশেই থাকবো সেখানকার বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও ঐতিহ্যে অংশীদার হবো। অংশীদার হবো সেখানকার নির্মাণে, উন্নয়নে, সুনামে, স্বপ্নে ও শাসনে। সেই সাথে আমাদের সঙ্গে থাকবে দীনি দাওয়াতের মহিমময় সওগাত। আল্লাহর প্রতি লালিত যে বিশ্বাস আমরা বুকে ধারণ করে আছি তা ঘোষণা করে বেড়াব পূর্ণ আস্থা ও তৃপ্তির সাথে। কারণ, আমরা যদি একত্ববাদের এই সংগ্রামী পয়গামকে নিজেদের বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখি তাহলে পরকালে মহান মালিকের সামনে এই জন্য আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। জবাবদিহি করতে হবে, কেন আমরা এই ইবরাহিমী দীন ও মুহাম্মদী ওয়াতকে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে দিইনি।

বনি ইসরাইলের অনুকরণ থেকে হুঁশিয়ার

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-এর স্বজাতি বনি ইসরাঈলের একটি শিক্ষামূলক ঘটনা বর্ণনা করেছেন পাক কুরআনে। এই ঘটনায় আমাদের জন্যও বিশাল শিক্ষা রয়েছে। ঘটনাটি এমন–

وَجَا، وَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَا ئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ
يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ
اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝ اِنَّ
هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَا
لَمِيْنَ ۝

বস্তুত আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনি ইসরাঈলকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যারা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তারা বলতে লাগলো, হে মূসা! আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতো একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। এরা যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা তো ভুল। তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোনো মা'বুদ অনুসন্ধান করবো? অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। [সূরা : আ'রাফ : ১৩৮-১৪০]

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে বনি ইসরাঈলকে তাঁর পরিচয় ও মা'রিফাত দান করেছিলেন। দান করেছিলেন একত্ববাদের অমেয় সম্পদ। তিনি তাদেরকে ঈমানের ধনও দিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন, আমি ছাড়া এই বিশাল ভুবনে অন্য কোনো উপাস্য নেই। প্রকৃত শাসক ও আইনদাতাও আমিই। কিন্তু তারা ছিল এতটাই নির্বোধ। চলতে চলতে এক মেলায় গিয়ে দেখলো অনেক মানুষ। তারা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পূজা করছে। এই দৃশ্য দেখে তাদের মুখেও পানি এসে গেল। বায়না ধরে বসলো, মূসা! আমাদের জন্যও এমন একটি উপাস্য ঠিক করে দাও। আমরা তাকে মা'বুদ মানবো, তাকে পূজা দেবো।

সময়ের শ্রেষ্ঠ একত্ববাদী নবী মূসা (আ.) প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তোমরা তো মূর্খ জাতি! তোমরা দেখ না, এরা যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তা তো ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এরা যা কিছু করছে তা তো ভুল। তিনি আরো বললেন, আমি কি আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য আরেকজন মা'বুদ খুঁজে বের করবো? অথচ তিনিই তোমাদের বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

অর্থাৎ তোমরা কি কিছুই বুঝ না? এই তাওহিদ ও একত্ববাদের ভিত্তিতেই তোমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা লাভ করেছো। আর তোমরা সেই মহান শক্তিধর প্রভুকে ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছ? তিনিই তো তোমাদেরকে ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেন।

অবিরাম সংগ্রামের পথ

ইবরাহিমী খান্দানের এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, তারা যেখানেই থাকবে তাদের হৃদয়ে থাকবে সত্যের পয়গাম। তারা তাওহীদের বাণী গেয়ে যাবে অবিরাম। আল্লাহর পথে ডেকে যাবে সকলকে। আল্লাহর পথের শাশ্বত পয়গাম প্রচারের এই মহান ভাগ্য ইবরাহিমী খান্দানেরই নসীব। এটা এই ঈমানী খান্দানের বিস্ময়কর গৌরব। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যাবেন, অনুসন্ধান করলে দেখবেন, এখানেও কোনো না কোনো কালে ইবরাহিমী পয়গাম উচ্চারিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুহাম্মদী আত্মীয়তা।

এই পৃথিবীতে বারবার যুদ্ধ হয়েছে। আমাদের নিকট অতীতে দুটি বিশ্ব যুদ্ধের ঘটনা ঘটে গেছে। ভয়ংকর ধ্বংসলীলা দেখেছে পৃথিবী। কিন্তু এই ধ্বংস খেলার খেলোয়াড়দের কেউই ইবরাহিমী নয়। বরং এ যুদ্ধ ছিল পেটের জন্য। এ লড়াই ছিল বাজার দখলের। বাণিজ্য ও শাসনদণ্ড কব্জা করার লড়াই ছিলো এগুলো। হীনস্বার্থপ্রবণ এই ধ্বংসলীলার সাথে এই ইবরাহিমী মিল্লাতের কোনো যোগসূত্রতা নেই।

আজ একবার এই পৃথিবীটা ঘুরে দেখুন। যেখানেই দেখবেন একজন মানুষ 'আল্লাহ'কে ডাকছে কিংবা অন্যদেরকে শেখাচ্ছে 'আল্লাহর জপ' অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সে নিশ্চয়ই ইবরাহিমী কিংবা মুহাম্মদী খান্দানের লোক। সে মুহাম্মদী আত্মীয়তায় সূত্রিত, ইবরাহিমী সভ্যতার সে দূরের কিংবা কাছের আত্মীয়। বিশ্বাস ও সভ্যতার ডাকে সে এই নতুন আত্মীয়তার সন্ধান পেয়েছে। এই খান্দানের মহান দায়িত্ব হলো, কিয়ামত পর্যন্ত তারা মানুষের মাঝে তাওহীদের ঘোষণা, ঈমানের দাওয়াত, আল্লাহর ভয় ও পরকাল চিন্তার অমূল্য বাণী ছড়িয়ে যাবে। তারা কখনও বাধার তরঙ্গ দেখে থমকে দাঁড়াবে না; স্রোতের প্রতিকূলে কিশতি চালাতে কাঁপবে না বুক; হাত বিকল হবে না, হিম্মত বসে পড়বে না হাঁটু পেতে; তারা শুধু এগিয়েই যাবে অসীম সাহসে।♣

সীমালঙ্ঘনকারীদের সাথে কোন আপস নেই

وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ-
وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ۝

যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; পড়লে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। তখন আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের কোনরূপ সাহায্য করা হবে না। [হুদ : ১১৩]

আমরা অনেকেই যৎসামান্য আরবী ভাষা জানি। এখানে যে আয়াতটি আমি পত্রস্থ করেছি তার অর্থও হয়তো আমরা অনেকেই জানি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জ্ঞানের অনুভূতি ও পাণ্ডিত্যের দাবী বাণীর মূল রহস্য নিগূঢ় মর্ম ও কাঙ্ক্ষিত দাবী উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফের ভাষা আরবী। তাই কুরআন ও হাদীসের চয়িত ব্যবহৃত শব্দগুলো আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বইপত্রে দৈনন্দিন বোল-চালে প্রতিনিয়তই চোখে পড়ে। শ্রুত উচ্চারিত হয়। গড়ে ওঠে পরিচয়। এই পরিচয়ই পরে কুরআন-হাদীসের মূল মর্ম অনুধাবনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। শ্রোতা যখন এই পরিচিত শব্দগুলো

কুরআন-হাদীসের ভাষায় শোনতে পায় তখন সে ভাবে, আমি তো এর অর্থ বুঝিই। অথচ শব্দেরও এক ধরনের উষ্ণতা-শীতলতা আছে। অন্যান্য বস্তুর মতো শব্দের মধ্যেও টেম্পারেচার আছে। আল্লাহ তাআলা যাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দেন, সত্য উপলব্ধির বিশেষ আত্মিক শক্তিতে করেন বলীয়ান তারাই শব্দের এই তাপমাত্রা উপলব্ধি করতে পারেন। আরবী ভাষীদের সংস্পর্শ, ইখলাসদীপ্ত সান্নিধ্য ও আল্লাহর দরবারে বিনীত প্রার্থনার মধ্য দিয়েই কুরআনে কারীমের সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে আর তখনই সে পাক কালামের মধুর মর্ম শনৈঃ শনৈঃ বুঝতে শুরু করে। তবে পরিপূর্ণ বুঝার দাবী তো কেউ করতে পারে না। সম্ভবও নয়।

উল্লিখিত আয়াতটিতে যে শক্তি ও দৃঢ়তা নিহিত রয়েছে সে কারণেই আমাকে এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিতে হয়েছে। বলতে হয়েছে আমাদের ভাষাজ্ঞানই অনেক সময় আমাদেরকে পাক কুরআনের গভীর মর্ম উপলব্ধি করতে দেয় না। আমরা হয়তো উল্লিখিত আয়াতটির প্রায় সবক'টি শব্দেরই অর্থ জানি। তবে আয়াতের মূল প্রাণ, অলৌকিক বাণী ও শাব্দিক শক্তি উপলব্ধি করা মোটেও সহজ নয়।

আয়াতটিতে ইরশাদ হয়েছে, জুলুম ও অবিচারই যাদের বৈশিষ্ট্য, জীবন যাদের সত্যপথ থেকে বিচ্যুত, আল্লাহ থেকে যারা দূরে নিপতিত তোমাদের হৃদয় মন যেন তাদের প্রতি ঝুঁকে না পড়ে। অন্যথায় এর পরিণতিতে তোমাদেরকেও আগুন স্পর্শ করবে। তোমরা নিপতিত হবে দুর্বিষহ আযাবে। অধিকন্তু –

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ۝

আর তখন আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদেরকে কোনরূপ সাহায্য করা হবে না। [হুদ : ১১৩]

এটা সুবিদিত সত্য, যখন এই পৃথিবীতে ইসলামের প্রকাশ ঘটে তখন এই পৃথিবীতে দুই ধরনের শক্তির অস্তিত্ব ছিল। এক. ধর্মানুসারী বলে দাবীদার শক্তি। ইহুদী-খৃষ্টানরা ছিল এ গোষ্ঠীর অগ্রপথিক। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীরাও ছিল

এ শিবিরেরই অংশীদার। এদের মধ্যে ইহুদীদের সম্পর্কে পাক কুরআন বলেছে, 'মাগ্‌দূবি আলাইহিম– তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অভিশাপ'– আর খৃষ্টানদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– 'দল্লীন– এরা পথভ্রষ্ট'। আর যারা কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয় বরং সরাসরি মূর্তিপূজায় আক্রান্ত তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় পাক কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۞

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এটা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে খুশি ক্ষমা করে দেন। [নিসা : ৪৮]

দুই. তৎকালীন পৃথিবীতে এর বাইরেও কিছু জাতি ও গোষ্ঠী ছিল। তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় বলয় মুক্ত। তবে তারাও নিজেদের জীবন পদ্ধতি, অবিচারী তৎপরতা, জুলুম-নিপীড়ন-সীমালঙ্ঘন, বিলাসী চরিত্র, আসমানী শিক্ষার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন, অবিরাম পাপাচার, দুনিয়াপূজা ও রিপুর দাসত্বের ফলে শিকার হয়েছিল আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্বীয় রহমত ও করুণার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন ভালোবাসা ও মমতার ছায়া থেকে। তাঁর ক্রোধ বর্ষিত হয়েছিল তাদের চিন্তা সভ্যতা সমাজ ব্যবস্থা চাল-চলন ও রীতিনীতির উপর। পতিত হয়েছিল তাদের প্রতি মহান প্রভুর ঘৃণার দৃষ্টি। পরিণতিতে তারা বঞ্চিত হয়েছিল ইলাহী দয়া ও করুণার বিস্তীর্ণ আশ্রয় থেকে। তাদের সে বঞ্চনার কথা হাদীসের ভাষায় বিধৃত হয়েছে এভাবে–

إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ-

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন (আসমানী শিক্ষায় বিশ্বাসী) কতিপয় আহলে কিতাব ব্যতীত আরব-আজম সকলকেই ঘৃণা ও অবজ্ঞা করলেন...

এ ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবকালীন পৃথিবীর চিত্র। তখনও পৃথিবীতে ধর্মানুসারীর সামান্য অস্তিত্ব ছিল। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ স্বীয় ধর্মের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করা, আসমানী শিক্ষাকে অবজ্ঞা করা এবং আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীকে পদদলিত করার কারণে ছিল মহান মালিকের ক্রোধের শিকার। কেউ বা ছিল পথভ্রষ্ট। তাছাড়া যারা সেকালে সভ্যতা-সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক ও চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল– তাদের জীবন চিন্তা, সমাজ ব্যবস্থা, চাল-চিত্র সবই আল্লাহ তাআলার কাছে অপছন্দ হয়েছে। অপছন্দ হয়েছে তাদের দৃশ্য-রূপও।

এসব কথা আমাদের নবীর জীবনীতে আমরা বারবার পড়ি। কিন্তু এর মূল মর্ম অনুভব করতে ব্যর্থ হই। এটাই মানুষের স্বভাব। আমরা যখন শহরে যাই তখন শহরের নানা স্থানে ঝুলন্ত সাইনবোর্ডে দৃষ্টি পড়ে। সেগুলো পড়ার প্রতি বিশেষ আকর্ষণও বোধ করি না। তাছাড়া অনেকের আবার ঘরের ভেতর নানা ধরনের বোর্ড ঝুলানোর শখ আছে। ক'দিন পরেই দেখা যায়, এরও আকর্ষণ শেষ। দেখতে দেখতে পানসে হয়ে যায়। দৈনন্দিন জীবন-চিত্রের এক অতি সাধারণ বস্তুতে পরিণত হয়। পরে আর চোখ তুলে তাকাতেও মন চায় না। সখে আঁকা ছবিটি দৃষ্টি মেলে তাকাবার সময় হয় না তখন।

হাদীস শরীফে আছে, ইরানের বাদশাহ এক ব্যক্তিকে ইয়ামানে পাঠাল। ইয়ামান ছিল তখন ইরানের শাসনাধীন। বাদশাহ তাকে নির্দেশ দিল, সেখানে যে ব্যক্তি নবী বলে দাবী করেছে তাকে ধরে নিয়ে আসবে। কারণ, এই ইরানীরা তখন আরবদেরকে মনে করতো অনুগত দাসের মতো। ভাবতো এরা আমাদেরই করুণা নির্ভর জাতি। আমরা যখন খুশি তখন তাদের উপর শক্তি খাটাতে পারি।

বড় কথা হলো, আরবে আকর্ষণ করার মতো কিছু ছিল না এবং এটা একান্ত আল্লাহ তাআলারই অদৃশ্য অনুগ্রহ, হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু আরবের প্রতি সাহসী বিজেতা ও ক্ষমতালোভীদের নজর পড়েনি। তারা ভাবতো, ওখানে গিয়ে কী লাভ? কী পাব ওখানে? উড়ন্ত ধূলি? আদিগন্ত বিস্তৃত সাহারা। উটের পশম আর চামড়ার তৈরি তাঁবু।

কাঁচা মাটির ঘর। সেখানে গিয়ে মূল্যবান সময় খুইয়ে আসবমাত্র। বিনিময়ে কিছুই তুলে আনতে পারবো না। তখনও তো পেট্রোল আবিষ্কার হয়নি। সোনা-রূপার খনির সন্ধানও মেলেনি। তাই ইরানীদের চোখে এই আরব্য মরু সাহারার বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। মূল্য ছিল না বলেই ইরানী বাদশাহ খুবই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেছিল, একজন গিয়ে তাকে (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) ধরে নিয়ে এসো।

আদিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে এসে উপস্থিত। উপস্থিত প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক দরবারে। তাকে দেখেই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ ফিরিয়ে নিলেন। ইরশাদ করলেন– এর দাড়ি মুণ্ডিত। আমাদের দেশে তো এর প্রচলন নেই। তার দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

এটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবকালে পৃথিবীর তাহযীব-তামাদ্দুন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা, মানব ও মানব সমাজের যাপিতরূপ, আচরিত চিত্র আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছায়া ফেলত। সেকালের জীবনচিত্র, যাপিত সভ্যতা, পালিত রেওয়াজ সবই ছিল আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে চরম অপছন্দনীয়। এটা স্বাভাবিক, কারো প্রতি যদি কোন কারণে ঘৃণার সৃষ্টি হয় তখন তার সবকিছুই চোখে কাঁটা হয়ে বিঁধে।

আমরা মনে করি, শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামের বিধান বলতে দুটি বিষয়ই রয়েছে। ঈমান ও কুফুর, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয। এর বাইরে অন্য কিছু আমাদের মাথায় থাকে না। অথচ এর বাইরেও এমন অনেক বিষয় আছে যাকে কুফুর কিংবা হারামও বলা যায় না– বলা যায় না হালাল কিংবা বৈধও। তবে এসব বিষয়কেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক. আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় বিষয় আর দুই. আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয় বিষয়। এ কথা আমরা কুরআনে কারীমের অধ্যয়ন, হাদীস শরীফের নির্দেশনা, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বভাব-চিন্তা এবং সাহাবায়ে কেরামের চিন্তাধারার আলোকে জানতে পারি। আমরা এসবের ঘনিষ্ঠ পাঠ ও নিবিড় অধ্যবসায় থেকে বুঝতে পারি, ঈমান

ও কুফুর, হালাল ও হারাম এবং জায়েয-নাজায়েযের বাইরেও কিছু বিষয় রয়েছে। আর তাহলো, জীবনযাপনের পদ্ধতি, জীবনের ধরন-স্টাইল, আকার-আকৃতি, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, পার্থিব জীবনের সাজসজ্জা ইত্যাদি।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব আর ইসলামের আগমন সমকালীন পৃথিবীর কাছে শুধু শিরক বর্জন, কুফুরীকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা আর ঈমান আনয়নের দাবী জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; বরং ইসলাম ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমকালীন মানবগোষ্ঠীকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-সভ্যতাও দান করেছে। দান করেছে জীবনযাপনের পরিপূর্ণ পদ্ধতি। আল্লাহর প্রিয় পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে তোলা হয়েছে, সতর্ক করে তোলা হয়েছে আল্লাহর দৃষ্টিতে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত পথ ও জীবন সম্পর্কেও। যাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে তাদের কথা ও পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, অভিশপ্তদের ধ্বংসাত্মক জীবন ও কর্ম সম্পর্কেও করা হয়েছে সম্যক সতর্ক।

আল্লাহ তাআলা যাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন মুসলমানদেরকেও তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে করেছেন উৎসাহিত। পবিত্র ইসলামের এ এক নিগূঢ় তত্ত্ব। আমাদের মুসলিম সমাজের অনেক প্রাজ্ঞজনের দৃষ্টিও এ তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি। ফলে অনেকেই অবলীলায় বলে বেড়ায়– এটা তো আর ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়। এটা করলে তো আর কাফের কিংবা ফাসেক হয়ে যাবে না। বলি, হ্যাঁ! আপনি যখন কোন দায়িত্ববান ব্যক্তি বা মুফতী সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি হয়তো আপনাকে এ কথাই বলবেন। শরীয়তের বিধিবদ্ধ আইনের আলোকে হয়তো এই সিদ্ধান্তই শুনিয়ে দেবেন। বলে দিবেন, এটা কুফুরীও নয় ফাসেকীও নয়। অথচ আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, এখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ তাআলার করুণা থেকে বঞ্চিত ও অভিশপ্ত এবং ইসলামকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে স্ব-সভ্যতায় অটল সম্পদপূজারী, ক্ষমতার কাঙাল, রিপুর দাসদের বৈশিষ্ট্য। এগুলো বৈশিষ্ট্য তাদের যারা নববী যুগেও ছিল ঈমান থেকে বঞ্চিত, বঞ্চিত ছিল পরবর্তী সকল কালেও। দেখা গেছে, এসব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যারা বুকে ধারণ করেছে, এই বঞ্চিতদের জীবন-চিন্তা হয়েছে যাদের পথ তারাও শিকার হয়েছে একই পরিণতির।

একজন মুসলমান যখন দীনি মেযাজ অর্জন করতে চেষ্টা করে, শুধু লৌকিক ও জাহেরী বিধানাবলীর আনুগত্যই নয়– বরং সে যখন নিজেকে আল্লাহর রহমত ও হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুআ ও শুভকামনার উপযুক্ত পাত্র হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় এবং সে যখন ভাবে– আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখোমুখি আমাকে হতে হবে, আমার এই আকার-আকৃতি তাঁদেরকে দেখাতে হবে। অধিকন্তু সে যখন ভাবে, আমাকে কবরে গিয়ে ফিরিশতার প্রশ্নোত্তরের মুখোমুখি হতে হবে কিংবা যখন মনে হয় হাশর-চিত্রের কথা, অথবা সে যদি মনে করে তার চিন্তা অনুভূতি পছন্দ অপছন্দের পূর্ণ বিবরণ আল্লাহ তাআলার কাছে সংরক্ষিত আছে। সংরক্ষিত আছে চোখে দেখা সত্যের মতো এবং তার ভাবনা ও বিশ্বাসে কোন সংশয় নেই। কুরআন হাদীস ও নবী-জীবনের সুবাদে প্রাপ্ত বিশ্বাসে কি কোন সংশয় থাকতে পারে? যদি থাকে তাহলে সে তো ঈমানের দুর্বলতার সাক্ষী। যারা কবর হাশর ও পরকাল সম্পর্কে উপরোক্ত বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত তাদের কাছে আমাদের আশা হলো, অমুসলিমদের ধর্মীয় কর্মসূচি, ইসলাম বিদ্বেষীদের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরতদের চিন্তা সভ্যতা সংস্কৃতি আকৃতি সব কিছুকেই ঘৃণার চোখে দেখবে। চরম শত্রুকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করার মতোই তাদের সবকিছুকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করবে।

আমি এটাকে কোন ক্ষুদ্র ও বলার জন্যে বলার বিষয় মনে করি না। মনে করি না, এটা করলে ভালো না করলেও কোন আপত্তি নেই। বরং আমি বলি, নামায রোযা হজ যাকাত ইসলামের প্রধান ভিত্তি তো আছেই। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহও অবশ্যপালনীয়। তবে সেই সাথে অমুসলিমদের কৃষ্টি কালচার বেশ-ভূষা আচার-আচরণ (যাকে ইংরেজিতে IDEAL AND VALUES বলে।) ও অবশ্য পরিত্যাজ্য, ঘৃণার সাথে বর্জনীয়। আর এগুলোকে ঘৃণাসহ সযত্নে পরিহার করার প্রতিই এই আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে–

وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۝

যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; পড়লে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। [হূদ : ১১৩]

তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার অর্থ হলো, তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা, তাদের জীবনাচারকে পছন্দ করা। একজন আমেরিকান কিংবা ইউরোপিয়ান যখন কোন ইন্টারভিউ কিংবা অফিসে যাচ্ছে পূর্ণ আমেরিকান বা ইউরোপিয়ানরূপে তখন তাকে দেখে কেউ আগ্রহ ও আকুলতার দৃষ্টিতে তাকালো। বলল, এই তো উন্নত জাতির রূপ, এই না সভ্য মানুষ। বলল, সমাজ ব্যবস্থা তো এদের মতো হওয়া উচিত। বেশ দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর মুখ সেভ করে। গোসল করে। নতুন পোশাক পরে। তারপর নাশতা করে অফিসে যায়। এই না জীবন-শৃঙ্খলা। জীবনযাপনের এই না শীলিতরূপ। মনে রাখতে হবে, যদি কারও মনে এই ধরনের ধারণার উদয় হয় আর তার প্রতি কোন 'সাহিবে কাশফ' বুযুর্গের দৃষ্টি পড়ে তাহলে তিনি তার ঈমানের 'গোলমাল'টাও দেখতে পাবেন।

সাধারণ মুসলমানদের প্রতি এবং বিশেষভাবে মাদরাসা-শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার স্পষ্ট দাবী হলো, তাদেরকে শুধু যথারীতি নামাযের পাবন্দী করলেই হবে না, শুধুমাত্র ইসলামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলীকে বর্জন করলেই চলবে না; বরং তাদেরকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেয়া জীবনাদর্শ ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গর্বের সাথে অনুসরণ করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রোম ও শামের রাজধানীতে, দামেশ্‌ক, হালব, কনস্টান্টিনোপল, মাদায়েন ও ইরাকসহ পৃথিবীর বড় বড় শহরে যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন।

একটি ঘটনা মনে পড়লো। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক সাহাবী। ইরানের গভর্নর হয়েছেন। খেতে বসেছেন। তার হাত থেকে সামান্য খাবার মাটিতে পড়ে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খাবারটুকু তুলে পরিষ্কার করে মুখে রেখে দিলেন। উপস্থিত একজন খুব বিস্ময়ের সাথে তাঁকে শোধালেন– আপনি একজন গভর্নর। এত উঁচু আসনে সমাসীন হয়ে এমন কাণ্ড করলে মানুষ কী ভাববে! উত্তরে সাহাবী বলেছিলেন–

أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيْبِيْ لِاَحْمَقٍ مِثْلِكَ؟

আমি কি তোমার মত একজন বেকুবের কথায় আমার প্রিয় নবীর আদর্শ ছেড়ে দেব?

মনে পড়ে, হযরত আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্যে ফিলিস্তিন যাচ্ছিলেন তখন রুমের সকল অধিবাসী বিজিত অবিজিত সকল অঞ্চলের দর্শকরা এসে সেদিন জমায়েত হয়েছিল। সকলের চোখেই এক আকুল চঞ্চলতা। আমীরুল মুমিনীন আসছেন। মহান খলীফা আসছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব আসছেন– যিনি রোম-ইরানের শাসন দণ্ডকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। শত শত বছরের ঐতিহ্যের দাম্ভিকতাকে পদদলিত করেছেন। সকলের কল্পনা জুড়ে এক ভাষাহীন অস্থিরতা। উমর! কী হবে তাঁর রূপ! কী হবে তাঁর প্রতাপ! কেমন হবে তাঁর দাপটপূর্ণ শুভাগমন! কিন্তু যখন তিনি এলেন তখন সকলেই তাজ্জবের সাথে লক্ষ করলেন তাঁর গায়ে ছেঁড়া জামা। একটি অতি মামুলি ঘোড়া তাঁর বাহন। মনযিলের কাছাকাছি এসে পৌছলে মহান সাহাবী হযরত আবু উবায়দা (রা.) আরয করেছিলেন– আমীরুল মুমিনীন! একটি ভালো কাপড় পরে নিলে হয় না! অন্য একটি ভালো ঘোড়া...! এ কথা শোনার পর হযরত উমর (রা.) ধরা কণ্ঠে বলেছিলেন– আবু উবায়দা! এমন কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে হল! আহা! তুমি বলছো, মানুষ আমার এই পোশাক দেখে কি বলবে! মানুষ আমার এই ছেঁড়া পোশাক শতবার দেখুক তাতে কি! যখন আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবেসেছি, ভরসা যখন তাঁরই উপর তখন সম্মান ও অপমানের মালিক তো তিনিই।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ...

(হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি বলুন, হে আল্লাহ! সকল রাজত্বের তুমিই অধিপতি। তুমি যাকে খুশি রাজত্ব দাও আবার যাকে খুশি বঞ্চিত কর; যাকে খুশি তুমি সম্মানিত কর আর যাকে খুশি কর লাঞ্ছিত। [আলে-ইমরান : ২৬]

উমর (রা.) বলেছিলেন– যার সামনে এই আয়াত রয়েছে সে কি করে এ কথা ভাবতে পারে– এই কাফের বেঈমান পাপীরা আমীরুল মুমিনীনের প্রতি কী ধারণা করবে! আবু উবায়দা! এদের ধারণার কী মূল্য আছে বল! ইজ্জত ও অপমানের মালিক তো কেবলই আল্লাহ। তারপর বলেছিলেন–

لَوْ لَا غَيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدَةَ!

আহা আবু উবায়দা! কথাটি যদি অন্য কেউ বলতো...!

আবু উবায়দা! আমরাই ছিলাম পৃথিবীর লাঞ্ছিত ও পতিততম জাতি। আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন।

مَمَّا طَلَبْنَا الْعِزَّ بِغَيْرِ الْاِسْلَامِ اَذَلَّنَا اللّٰهُ

ইসলাম ব্যতীত যে পথেই আমরা সম্মান সন্ধান করবো
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

এ কথা আমি আমার মাদরাসা-শিক্ষিত ভাইদেরকেও বলবো, বলবো মুসলমান ভাইদেরকেও– তোমরা যদি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ছেড়ে দিয়ে, উলামায়ে কেরামের আদর্শকে উপেক্ষা করে অন্য কোন পথ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে সম্মান পেতে চাও তাহলে কোন দিনই সত্যিকারের সম্মান পাবে না। আমি আমেরিকা ইউরোপে গিয়ে এ সত্য স্বচক্ষে দেখে এসেছি। আমি বড় বড় সভা-সমিতিতে অংশ গ্রহণ করেছি। পৃথিবীর বড় বড় ব্যক্তি ও রাজা বাদশাহদের সাথে সাক্ষাত করেছি। কাছে থেকে তাদের জীবন ও মর্যাদার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছি। তারপর আমার কাছে মনে হয়েছে মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মালিক আল্লাহ। সম্মানের উৎস কেবল তাঁরই মর্জি। অন্য কিছু নয়।

কোনো দীনি মাদরাসারই প্রধান লক্ষ্য শুধু এতটুকুই নয় যে, শিক্ষার্থীরা কেবল নিয়মিত নামায পড়বে, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকবে। বরং এটাও একটা কেন্দ্রীয় লক্ষ্য– আমাদের শিক্ষার্থীরা সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈনে ইযাম মহান পূর্বসুরী ও বুযুর্গানে দীনের জীবনাদর্শকে, তাঁদের চাল-চলন, চিন্তা-সভ্যতাকে জীবনব্যাপী অনুসরণ করবে। দীনের মহান সংস্কারক, আউলিয়ায়ে কেরাম– যাঁদের উসিলায় এই পৃথিবী বেঁচে আছে–

আল্লাহর পথের মহান সংগ্রামী মুজাহিদীন ও দীনের অকুতোভয় সাধকদের জীবন-সভ্যতা, আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সম্মানের সাথে বরণ করবে এবং বিপরীত সকল সভ্যতা দর্শন ও সংস্কৃতির উপরে তুলে ধরবে।

আমি আপনাদের সমীপে আদর্শে অবিচলতার একটি উপমা দিচ্ছি। এ উপমা আমি বাধ্য হয়ে দিচ্ছি। আমার বড় ভাই মাওলানা ডাক্তার আবদুল আলী (রহ.)। প্রথমে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় পড়েছেন। তারপর ছুটে গেছেন দারুল উলূম দেওবন্দে। তিনি হযরত শাইখুলহিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তারপর স্বীয় পিতার কাছে দর্শনের গ্রন্থাবলী পড়েছেন। দর্শনের পাঠ শেষ করে গেছেন ভারতবর্ষের বিখ্যাত আয়ুর্বেদী চিকিৎসক হাকীম আজমল খান সাহেবের সমীপে। সেখানে ছয় মাস কাটিয়েছেন। বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার আনসারীর সাথেও তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। অতঃপর তিনি একেবারে গোড়া থেকে ইংরেজি পড়তে শুরু করেন। এটা ছিল বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন। হয়তো তখনও আমার জন্ম হয়নি। ইংরেজদের রাজত্ব তখন যৌবনে উত্তাল। মানুষ বলতো, বৃটিশদের রাজ্যে সূর্য ডুবে না। তখনও সূর্য ডোবার কিংবা ইংরেজদের পাঁয়তারা গোটাবার কোন লক্ষণও প্রকাশ পায়নি, সর্বত্রই তাদের জয়জয়কার। স্বাধীনতার বিপ্লব এবং খেলাফত আন্দোলনের পর তাদের পতনের হাওয়া বইতে শুরু করে। এর পূর্বে ইংরেজদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল উচ্চতর। মানুষ মনে করতো, মানুষকে শাসন করার জন্যেই ইংরেজদের জন্ম। তাছাড়া মানুষ তাদেরকেই জীবনের যথার্থ 'মডেল' মনে করতো। উন্নতি ও প্রগতির 'আইডিয়েল' ছিল ইংরেজ জাতি। মানুষ তাদেরকে সভ্যতার শ্রেষ্ঠরূপ জ্ঞান করতো।

সার কথা, আমার বড় ভাই নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে মেট্রিক পাশ করে গিয়ে ভর্তি হন খৃষ্টান মিশনারী পরিচালিত এক কলেজে। বিজ্ঞানীদের মাঝে বিতর্কিত জটিল একটি বিষয়ে পাশ করে CULVING COLLEGE-এ ভর্তি হন। তৎকালীন সময়ে ভারত বর্ষের দ্বিতীয় ইউনিভার্সিটি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তারপর ভর্তি হন মেডিকেল কলেজে। এই কলেজের প্রিন্সিপালসহ অধিকাংশ অফিসার হতো ইংরেজ। স্টাফদের অধিকাংশই

ইংরেজ হতো। আর জমিদারপুত্ররাই সাধারণত তখন মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করতো। ধনীর দুলালরা ছাড়া কেউ এসব কলেজের বারান্দায় পা রাখতে পারতো না। বইপত্রের মূল্য ছিল সাধারণের সাধ্যাতীত। তাছাড়া বিষয়টিও ছিল সাধনাসাধ্য। আমি আল্লাহর ঘরে বসে আজ সাক্ষ্য দিচ্ছি– বড় ভাই মেডিকেল কলেজ থেকে সুনামের সাথে এমবিবিএস পাশ করে বেরিয়েছেন– কিন্তু তার জুতা জামা দাড়ি কোথাও একবিন্দু পরিবর্তন সৃষ্টি হয়নি। যাপিত দীনদারীতে একচুল দাগ পড়েনি।

তিনি আমাকে নিজেই বর্ণনা করেছেন, তাঁদের বার্ষিক পরীক্ষায় কড়াকড়ি ছিল ভয়ানক। ঘাড় নাড়াবার সাধ্য ছিল না কারো। শরীর নাড়াতেও ভয় পেত শিক্ষার্থীরা। হল নিয়ন্ত্রকের প্রায় সকলেই ছিল ইংরেজ। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার তো কল্পনাও করতো না কেউ। অথচ ভাইজান বলেছেন– যখন নামাযের সময় হলো আমি আমার সিট থেকে ওঠে দাঁড়ালাম। মেঝে আমার সেরওয়ানী বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। যখন নামায শেষ করলাম তখন ডিউটিরত একজন প্রফেসর এসে আমাকে বললেন : 'মিস্টার হাসানী! আগে বললে আমি তোমার জন্যে একটি মুসল্লার ব্যবস্থা করে দিতাম।' অর্থাৎ প্রতিবাদ তো দূরের কথা যথা সময়ে নামায পড়াকে ইংরেজ প্রফেসরও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন।

ভাইজান শহরের একজন সফল চিকিৎসক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করতেন। আমার এখনও মনে পড়ে, কলেজের প্রিন্সিপাল নিজে কোথাও রোগী দেখতে যেতে না পারলে ভাইজানকে বলতেন : 'মিস্টার হাসানী! আমার পরিবর্তে তুমি যাও!' এতটা আস্থা ছিল তাঁর প্রতি। এই আস্থা তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতি। এই সময়ই তিনি সৌদী বাদশাহ আবদুল আযীযের সাথে সাক্ষাত করেন। ভারত বর্ষের বিখ্যাতজনদের সাথেও মিলিত হন। কিন্তু তাঁর দীনি অবয়ব আদর্শিক স্থিতি ও সাংস্কৃতিক মুন্সিয়ানায় কোনো দাগ পড়েনি। একেই বলে ইসতিকামাত– দীনি দৃঢ়তা। এই দৃঢ়তাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

মনে রাখবেন, পোশাকের সাথে পেশা কিংবা মান সম্মানের কোন সম্পর্ক নেই। বরং চরিত্রই হলো মূল ভিত্তি। আত্মবিশ্বাস ও যোগ্যতাই মূলত

সম্মান ও পেশাগত শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ। আধুনিক পৃথিবীতে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে সবচে' সম্মানিত ও মর্যাদাবান ইউনিভার্সিটি মনে করা হয়। জ্ঞানে নামে পৃথিবীর জ্ঞানীজনদের পীঠস্থান অক্সফোর্ড। সেখানকার ভাইস চ্যান্সেলার এবং প্রিন্সিপালের সাথে আমি আমার এই পোশাকেই সাক্ষাৎ করি। আমি আমার টুপি শেরওয়ানী তো বদলাই না। তবুও তারা সম্মানের দৃষ্টিতেই দেখে। আমার কাছে সংরক্ষিত তাদের পত্রগুলোই তার প্রমাণ। আমি সেখানকার শীর্ষ ব্যক্তিদের সাথে বৈঠককালে, তাদের বিজ্ঞজনদের উদ্দেশে যখন কথা বলেছি অত্যন্ত ঋজুতার সাথেই বলেছি। আমি বলেছি, অক্সফোর্ডে 'ইসলামিক সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত করে আপনারা মনে করবেন না, ইসলামের প্রতি কোনরূপ অনুগ্রহ করেছেন। আমি মনে করি, এটা ইসলামের একটি পাওনা ছিল। আপনারা ভদ্রতা ও সম্মানের সাথে তা পূর্ণ করেছেন। কারণ, এই পৃথিবী এখনও টিকে আছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলায়। পৃথিবী মৃত্যু-নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছিল। মানব জাতি জীবিত থাকার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছিল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানে তাঁরই উসিলায় সৃষ্টিকর্তা বাঁচিয়ে রেখেছেন এই পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের। সুতরাং অক্সফোর্ড অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামী সেন্টার' ইসলামের প্রতি কোন করুণা নয়।

এই যে আমরা ভাবি, আমাদের দীনি পোশাক ও আকৃতি বদলে ফেললে বুঝি কী হাতে পেয়ে যাব। আসলে এগুলো শেকড়শূন্য কল্পনা, ভিত্তিহীন স্বপ্নের বেলুন। প্রকৃত বিষয় হলো ব্যক্তিসত্তা। ঈমান ও আল্লাহ-বিশ্বাস মূল শক্তি। যোগ্যতাই পাথেয়। এগিয়ে যেতে হলে দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। আপনি মুসলমান হিসাবে নিজের দৃশ্যরূপ গড়ে তুলুন। আল্লাহ তাআলার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখুন। সাহসিকতার সাথে বের হোন। নবীর রূপ ও আদর্শকে জীবনে জড়িয়ে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। বরং এ জন্যে ভেতরে ভেতরে গৌরববোধ করুন। তাহলে দেখবেন, সম্মান আপনার অপেক্ষায় ডানা বিছিয়ে অপেক্ষা করছে। কর্ম ও অগ্রসরতার পথ আপনাকে নত মস্তকে স্বাগত জানাবে।

সাহাবীর কবরকে আল্লাহ তাআলা নূরের শিশিরে পূর্ণ করে দিন। কতটা আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন : 'তোমার মত বেকুবের জন্যে আমি

আমার প্রিয় নবীর সুন্নত ছেড়ে দেব?' সুতরাং আমরাও তো বলতে পারি, তোমাদের মত বিবেক বিক্রেতাদের কথায় আমরা আমাদের নবীর সুন্নত ছেড়ে দেব– যারা আজ এর হাতে বিক্রি হচ্ছে তো কাল ওর হাতে। যারা নিজেদের বিবেক মাথা ও সত্তাকে নিলামে তুলে দিয়েছে, যাদের জীবনে সততা বিশ্বস্ততা ও ঐতিহ্যেবোধ বলতে কিছু নেই– আমরা কি সেই নিঃস্ব দীনহীনদের কথায় আমাদের আদর্শের শেকড় ছেড়ে দেব?

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, সৌভাগ্যক্রমে যারা দীনি ইলম শিখেছেন তারা যদি সত্যিকার অর্থে ঈমানী শক্তি অর্জন করতে পারেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস যদি অর্জিত হয়, মানুষের প্রতি নির্ভরতার খাদ থেকে যদি তারা ওঠে আসতে পারেন– তাহলে জগতের মানুষ তাদের সাথে সাক্ষাতের আশায় কাতর প্রার্থনা নিয়ে ঘুরবে।

হযরত মির্জা মাযহার জানেজানাঁ (রহ.)-এর মজলিস। দিল্লীর বাদশাহ এসেছেন সাক্ষাত করতে। বাদশাহ পা ছড়িয়ে বসতে গেছেন আর মুখের উপর বলে দিয়েছেন– এটা 'ফকীর'-এর মজলিসের আদব পরিপন্থী। বাদশাহ বিনয়ের সাথে বলেছেন : হযরত! পায়ে ব্যথা! বললেন : তাহলে আসারই বা কী প্রয়োজন ছিল!

জগদ্বিখ্যাত বাদশাহ হারুনুর রশীদ সায়্যিদুনা ইমাম মালিক (রহ.)-এর খেদমতে আরয করেছিলো– শাহী দরবারে এসে আমাদেরকে একটু পড়িয়ে যাবেন। ইমাম মালিক (রহ.) বলে পাঠালেন–

اَلْعِلْمُ لَا يُؤْتٰى وَلَا يَأْتِىْ

"ইলম কারো কাছে যায় না
ইলমের কাছে আসতে হয়।"

হারুনুর রশীদ মেনে নিয়েছেন। বলেছেন : তাই হবে। চলে এসেছেন। যখন পড়ার সময় হলো বললেন, লোকজন বাইরে পাঠিয়ে দিন। আমি একা পড়বো। হযরত ইমাম (রহ.) বললেন, হবে না। এঁদের বরকতেই যা দেখছেন। অগত্যা হারুনুর রশীদ অন্য সকল ছাত্রের সাথে বসেই দরস গ্রহণ করেছেন। আমাদের পূর্বসুরীদের জীবনে এমন ঘটনা প্রচুর।

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) বছরের পর বছর দিল্লী শহরে

থেকেছেন। শাসক আলাউদ্দিন খিলজী আর কুতবুদ্দীন আইবেক কতবার কামনা করেছেন– যদি খাজা একবার দরবারে আগমন করতেন! একবার আমীর খসরু হযরত খাজা (রহ.)-এর দরবারে মিনতি জানাল– বাদশাহ বলেছেন, খাজার দরবারে যাবার তো অনুমতি পাচ্ছি না। একবার হঠাৎ করে পৌছে যাব। বললেন : বাদশাহকে বলে দিও, আমাদের ঘরের দুটি দরজা আছে। বাদশাহ এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে আমি দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব। বাদশাহ একবার দরবারে আসার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। খবর পেয়ে হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) ও সফরের উদ্দেশে গুছিয়ে নেন এবং অন্যত্র চলে যান।

আমাদের নিকট-অতীতের গল্প। ফিরিঙ্গি মহলে এক আলিম ছিলেন। অভাব ছিল সংসার জুড়ে। অনেকেই বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করতে পরামর্শ দিচ্ছিল। তিনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। ভক্তদের অনেক চেষ্টা-চরিত্রে একবার রাজি হলেন। তাঁর জন্যে দামী আবা আনা হলো। অনুরোধ করা হলো আবা পরতে। তিনি নারাজ। অবশেষে মা ও বড় ভাইয়ের কথায় পরলেন। গেলেন দরবারে। রেওয়াজ মাফিক দরবারে 'নজরানা' দিতে হয়। সফর সঙ্গীদের কাতর অনুরোধে নজরানা দিলেন বটে, তবে বাম হাতে। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বললেন : শোন! বাদশাহকে যদি ডান হাতে নজরানা দিই তাহলে পীরপুত্রকে দিব কোন হাতে? তাই ডান হাতে বাদশাহকে নজরানা দিতে পারব না। এ হাত পীরপুত্র এবং সম্মানিত শিক্ষকগণের জন্যে।

আজ আমরা এই আত্মমর্যাদাবোধই হারিয়ে ফেলেছি। এই সম্পদ হারিয়েছি বলেই আজ আমরা এই দুর্দশার শিকার। ঐতিহ্যের শেকড় থেকে ছিন্ন হয়ে পড়েছি বলেই আজ আমরা পথে বসেছি। সুতরাং আপস নয়। প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধের সাথে পথ চলা।♣

মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচে' বড় অপরাধ

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

'আমি মাদয়ানবাসীর নিকট তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মাবুদ নেই। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না। তোমরা যদি মুমিন হও তাহলে এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণের। [আরাফ : ৮৫]

শান্তির পর অশান্তি ...

মহান আল্লাহ তাআলার প্রিয় পয়গাম্বর হযরত শোয়াইব (আ.) তাঁর স্বজাতিকে লক্ষ করে বলেছিলেন এই কথাগুলো। মূলত সকল নবীরই দাওয়াত ছিল এটা। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর জমিনে শান্তি স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

বাহ্যত খুবই সরল শব্দে স্বীয় দাওয়াত পেশ করেছেন হযরত শোয়াইব (আ.)। কিন্তু তার অর্থ খুবই গভীর, সারগর্ভ এবং দরদসিক্ত। সাধারণত মানুষ এসব ক্ষেত্রে এভাবে নিবেদন করে– বন্ধুরা! ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, ঝগড়া করো না, ঝগড়া বাধিও না, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করো না, বিপর্যয় সৃষ্টি করো না ইত্যাদি। কিন্তু হযরত শোয়াইব (আ.) বলেছেন - তোমরা জমিনে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

যখনই আল্লাহর এই বিশাল ভুবনের কোন রাষ্ট্রে কোন সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা সংস্কৃতি কিংবা মানবতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, পরম করুণাময় প্রভুর সাথে মানব গোষ্ঠীর বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, মানুষে মানুষে বন্ধন সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, অন্যের অধিকার এবং নিজেদের কর্তব্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হয়েছে তখনই মানুষের জীবন সম্পদ সম্মান ও উত্তম আচরণের পাঠ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আদর্শ মানবতাবাদী সম্মানিত জীবন ও নিরাপত্তার। আল্লাহ তাআলার বান্দাদের এক বিরাট অংশ কোন কোন ক্ষেত্রে বরং পুরো দেশ, পুরো জাতি আল্লাহর দুনিয়ায় বিশাল অংশজুড়ে সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর আল্লাহ তাআলাও সেই সাধনাকে বিফল করেননি।

নিশ্চয়ই যারা মানবতার সংস্কার ও সভ্যতার এ সবক গ্রহণ করেছে তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কলজে ছেঁচা খুন দিয়ে হলেও তাকে ফুলে ফলে সুশোভিত করে তোলা। অতঃপর তারা তাই করেছে। জীবনের বাজি রেখেছে, মান-সম্মান স্বজন-সম্পদ সব কিছুই বিসর্জন দিয়েছে। পার্থিব সকল সাধ স্বার্থ ও সুবিধাকে বিসর্জন দিয়ে কেবল এই জন্যেই সাধনা করতে হয়েছে, যাতে মানুষ এই পৃথিবীতে মানুষের মতো জীবনযাপন করা শিখে, আল্লাহর বান্দা হয়ে জীবনযাপন করা শিখে। তাসবীহ'র দানাগুলো যেভাবে তাসবীহ'র সুতোয় গাথা হয়, যেভাবে মুতির দানা গাথা হয় মালার

গ্রন্থিতে ঠিক সেভাবে মানব জাতিকে ভ্রাতৃত্বের সুতোয় গেথে দেয়া হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

তোমরা সকলেই আদম সন্তান। আর আদম মাটির তৈরি।

কত চমৎকার উচ্চারণ। সকলেই এক সুতোয় গ্রন্থিত। মাটির সুতো। পুত্র সুতো। সুতরাং হে মানবমণ্ডলী! তোমরা সেই গ্রন্থিকে ছিন্ন করো না। অন্যথায় সবগুলো দানা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে।

হযরত শোয়াইব (আ.)-এর উচ্চারণে [শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না] এক গভীর দরদ অস্থিরতা বাঙময় হয়ে ফুটে উঠেছে। আল্লাহর প্রিয় পয়গাম্বরগণ শত শত বছর ধরে মানব জাতিকে মানবতার সবক পড়িয়েছেন, মানুষকে মানুষের মতো জীবন যাপনের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। পাখির মতো আকাশে উড়ে বেড়ানো, সিংহের মতো লম্ফ ঝম্প কিংবা বাঘের মতো অসহায়ের বুক চিরে রক্তাক্ত করার মধ্যে তো তোমাদের গৌরব গর্ব ও কৃতিত্বের কিছু নেই। তোমাদের জন্যে কৃতিত্ব ও প্রশংসার বিষয় হলো, তোমরা খোদার দুনিয়ায় খোদার বান্দা হয়ে জীবনযাপন করবে। অতএব এখানে অবাধ্যতার অবকাশ কোথায়?

হযরত শোয়াইব (আ.) এ কথা বলেননি–

পৃথিবী শান্তিময় হয়ে যাবার পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। বলেছেন, শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। বুঝা গেল, শান্তি স্থাপনের জন্যে নিশ্চয়ই কোন 'মুসলিহ' তথা শান্তি স্থাপক ও প্রতিষ্ঠাকারী চাই। অতঃপর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই দাওয়াত, সাধনা। আল্লাহর প্রিয় নবীগণ, মানবতাবাদের মহান নির্মাতাগণ মুবারক কল্যাণময় সাধনার মাধ্যমে এই মাটির পৃথিবীতে বেহেশতের পবিত্র দৃশ্য চিত্রিত করেছেন। মানুষ মানুষের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়েছে। ডাকাত দরবেশ বনেছে আর হিংস্রজনরা হয়েছে শান্তনমিত। বিসর্জন ও কুরবানীর আদর্শ স্থাপিত হয়েছে– সে এক বিস্ময়কর বাস্তবতা। যদি এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য দলীলসিদ্ধ সর্বজনখ্যাত ঐতিহাসিক সমর্থন না থাকতো তাহলে তো বিশ্বাস করাই মুশকিল ছিল।

অপরাধ এবং জুলুম

আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে সবচে বড় অপরাধ এবং নবী-রাসূলগণের দৃষ্টিতে সবচে' বড় জুলুম হলো, শুধুই নিজের স্বার্থ ও সুবিধার খাতিরে পুরো সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া– যে সমাজের প্রতিটি মানুষের ভাগ্য ও স্বপ্ন অন্যজনের সাথে গ্রন্থিত ও সম্পর্কিত। যদি কোনো সোসাইটি কিংবা রাষ্ট্রে কোন অপরাধ জেগে ওঠে আর সেখানকার অধিবাসীরা যদি ভাবে, এতে আমাদের কী এসে যায়? অমুক মহল্লায়, অমুক বংশে, অমুক শহরে এক ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে, এক ব্যক্তির বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে এক ভিনদেশী মুসাফিরকে রক্তাক্ত করা হয়েছে– তাতে আমাদের কি? আমাদের মহল্লায় তো কোন সমস্যা নেই।

এই চিন্তার, এই ধরনের মানসিকতার ফলাফল কী– এর নমুনা শুধু সংস্কৃতি সাহিত্য কেন মানবতার ইতিহাসেও আমি দেখিনি যত সুন্দর উপমা চিত্রিত হয়েছে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীসে।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– একটি কিশতিতে মুসাফিরগণ ভ্রমণ করছে। কিশতিটি দ্বিতল। [এটাও আমার দৃষ্টিতে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি মুজিযা। কারণ, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালে তো নৌজাহাজের তেমন প্রচলনও ঘটেনি। সেকালে ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড ক্লাসের তো কোন ভাবনাও ছিল না। বিশেষ করে আরবদের জন্যে তো নয়ই। অথচ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কথাই বলেছেন।] কিছু উপর তলার যাত্রী কিছু নীচ তলার। নীচ তলার অধিবাসীরা সাধারণত দরিদ্র হয়ে থাকে। তাই মিষ্টি পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে উপর তলায়। তাদের যত্ন ও আরামের আয়োজনও অধিক। তাই বাধ্য হয়ে নীচের যাত্রীদেরকে উপরে যেতে হয়। সেখান থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়।

পানির স্বভাবই উচ্ছ্বলতা। তার উপর আবার কিশতি সমুদ্রের তরঙ্গ দোলায় কম্পিত। তাই শত সতর্কতা সত্ত্বেও পানি এদিক সেদিক পড়বেই। কারণ, পানি তো আর জানে না, পাশেই যিনি বসা তিনি চৌধুরী সাহেব। পানি বুঝে না, এই কাপড়টি নওয়াব সাহেবের। তাই পানি তাদেরকে ভেজাবেই। এটাই তার স্বভাব। ভেজাবে একবার, দুবার, তিনবার,

চারবার... কিন্তু ... আপার ক্লাসের যাত্রীরা এটা কতক্ষণ বরদাশত করবে? তারা বলবে, তোমরা পানি নিতে এসে আমাদের এভাবে পেরেশান করবে এটা তো ঠিক নয়। তোমরা তোমাদের ব্যবস্থা কর।

এবার নীচের যাত্রীরা ভাবল, পানি ছাড়া তো আর বসবাস করা সম্ভব নয়। আর উপরে যখন যাওয়া যাবে না তখন নীচের দিক থেকেই ছিদ্র করে নিই। নিজেদের আসনে বসেই তখন পানি সংগ্রহ করতে পারবো এবং অন্যদের অনুগ্রহ নিতে হবে না। কারও মেজাযও সহ্য করতে হবে না।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যদি উপরওয়ালাদের বিবেক তালাবদ্ধ না হয়ে থাকে, যদি তারা দুর্ভাগা না হয়ে থাকে তাহলে খোশামোদ করবে, হাত-পা ধরবে, বিনয়ের সাথে বলবে, ভাই! তোমরা উপর থেকেই পানি নিয়ে নাও। খোদার কসম! তোমরা এই গযবের কাণ্ড ঘটিও না। কারণ, তোমরা যদি ছিদ্র কর তাহলে আমরা সকলেই ডুবে মরবো। উপর ক্লাস আর নীচের ক্লাসের কেউ বাঁচবে না।

আমরা সকলে এক কিশতির যাত্রী

আমরা আপনারা একই দেশে একই সভ্যতার পিঠে সওয়ার। একই কিশতির সওয়ার আমরা। সেই কিশতিটি হলো মানব সভ্যতা ও মানুষ সমাজের কিশতি। আমরা যদি স্বার্থপর হই, স্বীয় সুযোগ ও মতলবের শিকার হয়ে পড়ি, নিজ নিজ ঘরে বসেই মিষ্টি পানি লাভের চিন্তা করি তাহলে কিন্তু বিপদ আছে। আর সেই মিষ্টি পানি হলো, আমাদের মতলবসাধন ও স্বার্থসিদ্ধি। শুধুই নিজের সাধ স্বপ্ন ও স্বার্থের কথা ভাবলাম। অন্যের কথা, অন্যের স্বার্থ ও সুবিধার কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করলাম না। এ তো সেই কিশতিকে নীচের দিক থেকে ছিদ্র করে দেয়ারই নামান্তর।

আজ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে কিশতিকে তার তলদেশ দিয়ে ছিদ্র করারই প্রতিযোগিতা চলছে। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ ও সুবিধার শিকলে বাঁধা। অন্যের প্রতি চোখ তুলে তাকাতেও প্রস্তুত নয়। আমরা আমাদের মতলব উদ্ধারের সময়ে ভাবি না সমাজে এর কী প্রভাব পড়ছে। আজ সারা পৃথিবীই এই সংকীর্ণতা ও স্বার্থান্ধতার জঘন্য শিকার।

আজকের উম্মাহ : অনিবার্য কর্তব্য

আজকের মুসলিম উম্মাহ'র অনিবার্য কর্তব্য হলো, দেশ জাতি ও জগতকে এই ধ্বংস থেকে রক্ষা করা। এটা শুধু সরকারের কর্তব্য নয়। অসহায় বিপদগ্রস্ত অস্থির রুগ্ণ প্রশাসন কি-ই বা করতে পারে বলুন! পবিত্র কুরআনের আলোকে আমাদের কর্তব্য হলো, পবিত্র ইসলামের অসংখ্য দাঈ, মানবতার নিষ্ঠাবান কল্যাণকামী, দেশ ও জাতির নিঃস্বার্থ নির্মাতাদের হাজার বছরের সাধনাকে তো আমরা ধ্বংস করে দিতে পারি না। বরং কুরআনের স্পষ্ট পয়গাম– পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

আল্লাহর দরবারে তো অবশ্যই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের বর্তমানে এই দেশ কিভাবে ধ্বংস হলো? সুতরাং আমাদের এমনভাবে সচেষ্ট হতে হবে, আদর্শ ও জীবনবোধের এমন নমুনা স্থাপন করতে হবে– যাতে মানুষ বুঝতে পারে, পয়সা আর বিত্তই জীবনের সবকিছু নয়। পদ ও মর্যাদাই জীবনের শেষ স্বপ্ন নয়। আল্লাহর ভয়ই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অতঃপর পরস্পর প্রেম ও সকল সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা।

আমি বিশ্বাস করি, আপনারা যদি নিজেদেরকে এই আদলে গড়ে তুলতে পারেন তাহলে আপনারাই হবেন সমাজের প্রিয়জন আর রাজ্যের নেতৃত্ব আপনাদের সমীপে পেশ করা হবে পরম শ্রদ্ধার সাথে।♣

মুসলিমবিশ্ব আজ চূড়ান্ত পরীক্ষার মুখোমুখি

ভাবতে হবে উলামা মাশায়েখকে

উলামা ও বুদ্ধিজীবীদের উচিত ইসলামকে সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়া। সকল দল মাদরাসা ও একাডেমীর উর্ধ্বে ইসলাম। জীবনের সকল স্বার্থের উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে ইসলামকে। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, যদি এমন হয় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সকল দলকে মিটিয়ে দেয়া প্রয়োজন, সকল নাম সকল চিহ্ন মুছে দেয়া প্রয়োজন। তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তাই করতে হবে। এখানে থেমে দাঁড়াবার অবকাশ নেই। ভাবনা চিন্তার সুযোগ নেই। কারণ, আমরা মুসলমান। আমাদের পরিচয়ের সাথে মিশে আছে ইসলাম। ইসলাম আমাদের কাছে সবকিছুর চাইতে প্রিয়। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা হল এই সত্যটি তিনি সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। তাই তারা নিজেদের কর্ম ও অবদানকে অন্যের সামনে তুলে ধরতে বিন্দুমাত্র আগ্রহবোধ করতেন না। তারা বুঝতেন কেবল ইসলাম এবং পরকাল।

বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় আছে, সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.। একবার বসে বসে কথা বলেছিলেন। অতীতের সুখ দুঃখের কথা। স্মরণীয় স্মৃতি মন্থন করতে করতে তিনি বললেন : একবার আমরা এক

যুদ্ধে গেলাম। বেশ কষ্ট হয়েছিল সে যুদ্ধে। পায়ে ঠোসা পড়ে গিয়েছিল। অগত্যা পায়ে পট্টি বাঁধতে হয়েছিল। এ কারণেই সে যুদ্ধকে যাতুর রিকা বলা হয়। বাক্য কয়টি শেষ করতে না করতেই চমকে ওঠলেন। ভেঙ্গে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন এ কী করলাম! কেন বললাম আমি এই কথা কয়টি। এই কারণে যদি আমার আমল বাতিল হয়ে যায়। পরকালে যদি আল্লাহ তাআলা এই বলে সরিয়ে দেন- যুদ্ধ করে বলে বেড়িয়েছি যাতে মানুষ বড় যোদ্ধা বলে বীর বলে। বলেছে তো। এখন যাও। আমার দরবারে কেন এসেছো? কি নিতে এসেছো?

আজ পৃথিবী জুড়ে এই যুদ্ধই চলছে। কাজ তো হবে। কিন্তু কার নামে? কার নেতৃত্বে? এক ভদ্রলোক ছিলেন। নাম গাজী মাহমুদ ধর্মপাল। তার একটি ঘটনা মনে পড়ল। তিনি একবার ভাষণে বলেছিলেন- পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয় অমুক ব্যক্তি অমুক মহান ব্যক্তির পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলাম গ্রহণের পাশাপাশি সেই পবিত্র হাতেরও প্রচার করা হয়। বরং ইসলাম গ্রহণ কবুল হোক আর নাই হোক সেই মহান হাতটি কবুল হলেই যেন কেল্লা ফতেহ। হাতটির প্রচারই এখানে মুখ্য।

আমি তো দেখেছি আরও ভয়ানক কাণ্ড। নিজে দেখেছি। বড় বড় বুযুর্গ মনীষীদের ইন্তেকালে তাদের জানাযা পড়াবার জন্যে লাফিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। কারণ, খবর পত্রিকায় ছাপা হবে। ছাপা হবে তার নাম। এই মানসিকতা খুবই ভয়াবহ। প্রচণ্ড ক্ষতিকর।

একবার ভেবে দেখুন, যদি কারও আপনজন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তাদের রাত দিন একাকার হয়ে যায়। তারা ভাবেন না। এতে কার নাম হবে আর কার বদনাম হবে। তারা সকলেই বরং চায় কোনক্রমে আমাদের রোগী বেঁচে গেলেই হয়। এই নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে। কখনও হেকিমের কাছে যায়। কখনও ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে। আজ ইসলামী বিশ্ব অসুস্থ। জীবন তার ওষ্ঠাগত। মৃতপ্রায় আজ আপনার দেশ আপনার জাতি। সুতরাং এখন তো ভাবার সময় নেই কার নামে লেখা এই অবদান। ইতিহাস রচয়িতারা কিভাবেই বা লেখবে আমাদের সংগ্রামের কাহিনী। সেখানে কি লেখা থাকবে এই দেশকে সর্বাধিক উপকৃত করেছে কোন প্রতিষ্ঠান? কিংবা এই সংগ্রামে সবচে' বড় অংশ ছিল কোন দলের? হয়তো লেখা হবে না।

যেমন আজ পর্যন্ত জানা যায়নি তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে সর্বাধিক অবদান ছিল কার? কারণ, যারা এই মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন তারা এতটা আড়াল ধরে চলেছেন ইতিহাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আজ অবধি তাদেরকে আবিষ্কার করতে পারেনি। এখন বিশ্বময় যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধ পরস্পর চিন্তা বিভক্তির যুদ্ধ নয়। ইসলাম কুফুরের যুদ্ধ। বিষয়টি এভাবে বুঝুন, একটি মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। যে কেউ এর নির্মাণ কাজে শরীক হবে সেই যথাযথ প্রতিদান পাবে। এখানে কার কতটুকু হিস্‌সা আছে। কার নাম আগে কার নাম পাছে এটা মোটেই ভাববার বিষয় নয়। এই অপাঙতেয় ভাবনাটা সমাধিস্থ করতে হবে। আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই এই চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলতে হবে। সুদৃঢ় থাকতে হবে নিজেদের স্বকীয় মসলক ও আদর্শের উপর। আমরা যেটাকে সত্য মনে করি তার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। সেখান থেকে সরে দাঁড়াবার কোন সুযোগ নেই। চিন্তা ও আদর্শ বিক্রির কোন অবকাশ নেই। ব্যবসা করারও উপায় নেই। তবে সকলের লক্ষ্য হতে হবে ইসলামী দাওয়াত, সকলের লক্ষ্য হতে হবে দেশজুড়ে ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠা। সংগ্রাম হতে হবে এরই লক্ষ্যে যেন আমরা আমাদের দেশে সকলে ইসলাম দেখে যেতে পারি এবং এটা যেন অন্যদের জন্যে আদর্শ ও নমুনা হতে পারে।

এ জন্যে প্রয়োজন কুরবানী। আমাদের সকলকে যতটা সম্ভব উৎসর্গমনা হতে হবে। পরস্পর দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলতে হবে। আমাদের জীবন হবে সাদামাটা। উৎসর্গ ও ত্যাগ দীপ্ত। আমরা যত বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে পারব তত বেশি লাভবান হতে পারব। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক ক্ষতিকর বিষয় হলো পারস্পরিক লড়াই। আমাদের মধ্যে পরস্পরে জ্ঞান যুদ্ধ হবে। দলীল ভিত্তিক তর্ক-বিতর্ক হবে সেটা ভিন্ন কথা। তার ময়দানও ভিন্ন।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) তাঁর পত্রাবলীতে লিখেছেন- আকবর ধর্মের প্রতি বিরাগ হয়ে পড়েছে। তার কারণ হলো সে উলামায়ে কেরামকে পরস্পরে মোরগের মত লড়াই করতে দেখেছে। যদি কখনও কোন বিষয়ে কথা হতো তখন তারা এত ধারালো শানিত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো যা ছিল সত্যিই ভয়ানক। তারা অন্যের উপর নিজের বড়ত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এমনভাবে লড়তো যেভাবে দুনিয়াদাররা ধন-সম্পদ নিয়ে লড়াই করে। আত্মপ্রতিষ্ঠা নিয়ে সংগ্রাম করে।

আকবর নীরবে এসব দেখেছে। সে মনে মনে ভেবেছে এরা কেমন মানুষ! এরাই আমাদের উজীর-নাজির। এরাই আমাদের উপদেষ্টা ধর্মগুরু। অথচ সাধারণ পার্থিবতার দাসরাও তো এভাবে লড়াই করে না। এতটা নিচে নেমে আসে না।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) যখন জানতে পারলেন, বাদশাহ আলমগীর তাঁর দরবারে কিছু আলেম নিয়োগ করবেন পরামর্শ দেয়ার জন্যে, তখন তিনি নওয়াব সৈয়দ ফরীদকে এই মর্মে পত্র লিখলেন– বাদশাহকে দ্রুত পরামর্শ দাও মুখলিস নিষ্ঠাবান মাত্র একজন হক্কানী আলেমকে যেন পরামর্শদাতা হিসেবে রাখেন। এর বেশি নয়। এ ছিল হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর দূরদর্শিতা, ঈমানী দৃষ্টি।

আমি এ কথা বলি না, যে কোন ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা থাকবেন মাত্র একজন। তবে আমি এ কথা অবশ্যই বলি, উলামা মাশাইখের পারস্পরিক লড়াই কাদা ছোঁড়াছুড়ি আর একে অপরকে হেয় করার যে প্রতিযোগিতা চলছে তার ফলাফল এটাই দাঁড়ায়।

আশংকা প্রকাশ করার অধিকার তো সকলেরই আছে। একজন কচি ছেলেও আশংকা প্রকাশ করতে পারে। এ সুবাদে আমি দু'চারটি জরুরি কথা বলছি। এক. আপনি আধুনিক শিক্ষিতদেরকে এই ভুল ধারণার শিকার হতে দিবেন না, কুরআন সুন্নাহ এবং এর ব্যাখ্যায় রচিত ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহ এই আধুনিক যুগের সাথে চলতে অক্ষম। তারা যেন আমাদের কথা ও কর্ম থেকে এই ভুল ধারণায় ডুবে না যায়, ইসলাম আধুনিককালের সমস্যাবলীর জবাব দিতে অক্ষম। এটা বড়ই ভয়ানক ধারণা। এই ধারণা মানুষকে ধর্মত্যাগী করে ছাড়ে। দুই. আপনি আপনার কর্ম ও আদর্শ ছাড়া সাধারণ জনতা ও শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রভাব সৃষ্টিতে সচেষ্ট হন, আমরা উন্নত জাতি। আমরা নীচু শ্রেণীর মানুষ নই। আমাদের জীবনের সর্বত্র যেন সারল্য থাকে। অল্পে তুষ্টি আমাদের ভূষণ। বড় বড় গ্রেড আর ভাতা যেন আমাদের জীবনের লক্ষ্য না হয়ে বসে। মন্ত্রীরা যত পয়সা ও সুযোগ পায় সেটা ধরার জন্যে যেন আমাদের মধ্যে কামনা না জাগে। তাদের মত গাড়ি বাড়ি যেন আমাদের প্রত্যাশা না হয়।

আমি তো পরিষ্কার ভাষায় বলি, ছেঁড়া চাটাই যাদের আসন তারাই বেশি

কাজ করতে পারেন। কারণ, তাদের সামনে এসেই পৃথিবী মাথা হেট করে। আবার ছেঁড়া চাটাইর অভিনয় করার কথা বলছি না। ভণিতা করা এখানে অনর্থক। যা বাস্তব তাহলো যারা সত্যিকার অর্থেই ছেঁড়া চাটাইর বাসিন্দা তাদের সামনে এসে পৃথিবীর রাজা-বাদশাহরা সর্বদাই মাথা নত করেছে। আত্মসমর্পণ করেছে। শ্রদ্ধা করেছে। তাদের কথা মেনেছে।

আচ্ছা বলুন তো, মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সামনে সময়ের রাজা বাদশাহরা কেন এসে মাথা নত করেছিলেন? কারণ, তিনি কখনও কারও জন্য সুপারিশ করেন না। কারও দরবারে ধরনা দেন না। বসে বসে আল্লাহ যপ করেন। পরামর্শ দেন। আমাদের সমস্ত মাশায়েখে কেরামের এটাই আদর্শ ছিল। তারা কখনও রাজা বাদশাহদের দরবারে যেতেন না। তারা দূরে থাকতেন। দূরে থেকে পরামর্শ দিতেন। সতর্ক করতেন। প্রয়োজনে ভালো মানুষ জোগাড় করে দিতেন। তাদের জন্য দুআ করতেন। তারা বলতেন, দূর থেকে আগুন পোহাবে, মজা পাবে। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলে জ্বলে যাবে।

সার কথা হলো, আমরা একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রান্ত করছি এখন। সময়টা পরীক্ষাপূর্ণ। মুসলিমবিশ্ব আজ চূড়ান্ত পরীক্ষার মুখোমুখি। এখন সময় আমাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখার। আমাদের অযোগ্যতার কারণে যেন ইসলামের ক্ষতি না হয়, এ কথা ভাবতে হবে সবার আগে। আমাদের ইতিহাসে যেন এ কথা লেখা না হয়– এই সময়ের উলামা মাশায়েখদের অযোগ্যতার ফলে ইসলামের এই ক্ষতি হয়েছে। এ কথা মনে রেখেই এগুতে হবে। দৃপ্ত আশা ও ভয় তাড়িত মনে।♣

মুমিনের সফলতা যে পথে

হয় ঈমান নয় ধ্বংস

এতে কোন সন্দেহ নেই, মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করে আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবন ও আদর্শের উপর। আর এ কারণেই আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা আলোকপাত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। কোথাও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে; কোথাও আলোচনা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে এবং এ আলোচনা হয়েছে বারবার। আর তাঁদের সকলের জীবনাদর্শে একটি বিষয় অভিন্ন মূর্তিমান। এতে কোন ব্যতিক্রম হয়নি কখনও। তা হলো, শত বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁরা সর্বদাই সফল হয়েছেন। আর এই বিজয় ও সফলতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে হয়তো বিরুদ্ধবাদীরা ঈমান এনেছে, আল্লাহর দীনের সামনে আত্মসমর্পণ করেছে, রূপান্তরিত হয়েছে নবী-রাসূলগণের ভক্ত অনুরক্ত জানবায সহযোদ্ধায়। অথবা খোদায়ী আযাবে নির্মমভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের সকল বিনাশী অস্তিত্ব। ইরশাদ হচ্ছে-

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

আর অত্যাচারী সম্প্রদায় মূলোৎপাটিত হয়ে গেছে এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্যে। [আল-আনআম : ৪৫]

ব্যক্তি কিংবা জাতীয় স্বার্থের কোন মূল্য নেই

যে দাওয়াত ও দর্শনের উপর মানবতার ভাগ্য ও সফলতা নির্ভরশীল সে দাওয়াত আল্লাহর দরবারে সর্বাধিক মূল্যবান বরং অমূল্য সওদা। আল্লাহ তাআলা এই দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, এই দাওয়াতের স্বার্থ রক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বদলে দেন, সিদ্ধ পরিচিত পদ্ধতির ধারা, আইন ও নীতিমালাকে ভেঙ্গে দেন। আর সে দাওয়াত প্রতিষ্ঠার তরে এমন সব আয়োজন করেন যা কখনও কারও কল্পনায় আসেনি। স্বপ্নের মত করেও কেউ তা ভাবেনি। আর সেইসব ব্যক্তি ও জাতীয় স্বার্থ কিংবা নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠাস্বপ্ন যার মধ্যে কোন কল্যাণের বিজয় কামনা নেই; নেই অকল্যাণ অনিষ্টতা বিদূরণের বিপ্লবী আবেগ; বরং তাতে ইসলাম ও মানবতার এক বিন্দু লাভ নেই। তাদের নেতৃত্ব আর স্বার্থের সাথে অন্যায় ও অসত্য, অপরাধ ও কুফুরীর সাথেও কোনো সংঘাত নেই; বরং তাদের সকল সংগ্রাম ও ত্যাগকে ঘিরে আছে সমূহ পাপস্বপ্ন, আঁধারস্নাত অপরাধ বাসনা। তারা চায় সকল পাপকর্ম তাদের অধীনে হোক। সকল অন্যায় আয়োজনে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক শুধুই তাদের। বিনিময়ে তারা এর মুনাফা পাবে। তাদের পকেট ভারী হবে। আল্লাহর দরবারে এই জাতীয় নেতৃত্ব ব্যক্তি ও জাতীয় স্বার্থের কানাকড়ি মূল্য নেই। একটি মৃত মাছির ডানার চাইতেও মূল্যহীন এসব মেকি নেতৃত্ব পোশাকী মাতব্বরী। যারা এসব অন্ধ গলিত জগতের বাসিন্দা আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে ভাবেন না। তারা কোন প্রান্তরে গিয়ে বিনাশ হলো কিংবা আক্রান্ত হলো কোন শত্রুর হাতে- এসবের খবর আল্লাহ নেন না। দেখা যায়, তাদের এই অনর্থক জীবনযুদ্ধের এক পর্যায়ে মুখোমুখি হয় এমন ভয়ানক হৃদয়হীন শত্রুর যাদের অভিধানে দয়া ও ক্ষমা নামের কোন শব্দ নেই। অধিকন্তু তাদের জীবন যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৃষ্টি হয় এমন সব ভয়াল সমস্যার যার সূচনা কিংবা সমাপ্তির কোন হদিস নেই।

একটি ভুল ধারণা

বর্তমান মুসলিম জাতি এবং মুসলিম বিশ্বে একটি গ্রহণযোগ্য অতর্কিত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে 'আগে শক্তি অর্জন কর তারপর সবই হবে।' অর্থাৎ বস্তুশক্তিই সবচে' বড় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আজ মুসলিম উম্মাহর অস্থি-মজ্জায় আসন পেতে বসেছে এই ধারণা। তাদের দৃষ্টিতে সীরত ও আদর্শ নয় বরং বস্তুশক্তিই সমাধানের নিক্তি; সফলতা ব্যর্থতার মাপকাঠি। শুধু সাধারণ মুসলমান নয় বরং অনেক দীনদার শ্রেণীর লোকের মুখেও এ কথা শোনা যায়।

মূলত এটা একটা একান্তই ভ্রান্ত ধারণা। এই ধারণার ভ্রান্তি ও অসারতাই ফুটে ওঠেছে হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবন ও সীরাতে। তাঁদের জীবনে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনা দুর্ঘটনা অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ রহমত, কল্পনাতীত সাহায্য, অলৌকিক বিজয় ও দুশমনদের শোচনীয় পরাজয়ের নাঙা দীপ্ত ঘটনাবলীর আলোকে ফুটে ওঠেছে বস্তুকেন্দ্রিক এই ভোতা ও ভঙ্গুর ধারণার অসারতার কথা। আমি এখানে আমার স্বরচিত গ্রন্থ 'ছাওরাতুন ফিত-তাফকীর' (চিন্তা বিপ্লব) থেকে একটি উদ্ধৃতি কর্জ নিয়ে বলছি– 'দীর্ঘদিন হলো, আমরা আমাদের মর্যাদা ও গুরুত্বকে নির্ণয় করতে দারুণভাবে ভুল করছি এবং এ ভুল এখন রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আমরা এখন আমাদের মর্যাদা ও অবস্থানের মূল্যায়ণ করি বস্তুতান্ত্রিক শক্তি, বস্তুসর্বস্ব যোগ্যতা, পার্থিব উপায়-উপকরণ রাষ্ট্রীয় উৎপাদন আর সংখ্যা শক্তির আলোকে। আমরা আমাদেরকে মাপতে শুরু করেছি, আমাদের সমরাস্ত্রের বিচারে। পারমানবিক শক্তির মাপকাঠিতে আমরা আমাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে চাই। তখন আমরা কোথাও নিজেদেরকে শক্তিশালী দেখি; কোথাও দেখি দুর্বল। কখনও আনন্দিত-উৎসাহিত হই কখনও হই ব্যথিত হতোদ্যম।

দীর্ঘদিনের পশ্চিমা নেতৃত্ব ও হই-হুল্লোড় আমাদেরকে বশ করে ফেলেছে। আমরা পশ্চিমা নীতি-দর্শনের প্রতি চরম বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। আমরা যেন এ কথা মেনেই নিয়েছি, এটা একটা অনিবার্য তাকদীর, অবিচল আইন– যার মধ্যে কোন পরিবর্তনের অবকাশ নেই; কোন বিপ্লবের সুযোগ নেই। এভাবেই সেই আদি উপমা পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, 'যদি তোমাদেরকে

প্রশ্ন করা হয়, তাতারীরা কি কখনও কোথাও পরাজিত হয়েছে? তাহলে বিশ্বাস করো না।'

আমরা পশ্চিমাদের নেতৃত্ব এবং যোগ্যতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করার কথা ভাবি না। আর যদি কখনও 'অনুসন্ধান ও গবেষণা'র দিকটি উপেক্ষা করে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে তালাবদ্ধ করে সামান্য ভাবিও তা একান্তই বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের কথা ভাবতে গেলেই প্রথম জরিপ করতে শুরু করি– আমাদের সামর্থের পরিধি কতটুকু? সমরাস্ত্র, পারমানবিক শক্তির পরিমাপ কতটুকু? আমাদের অর্থ-উৎপাদনের ক্ষমতা কতখানি ইত্যাদি। আর যখনই এসব বিষয় নিয়ে ভাবি, মাপ-জোখ করি তখন আকাশ আকাশ হতাশা আমাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। আমরা বিশ্বাস করে বসি, আমরা শাস্তি পাবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছি। জীবনধারা থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থান করাই আমাদের কর্তব্য। তাছাড়া দু'টি বড় শক্তির একটির সাথে মিশে থাকার জন্যেই আমাদের পদার্পণ এই পৃথিবীতে। [ছাওরাতুন ফিত-তাফকীর : ৩৭২ পৃ.]

ঈমান ও আনুগত্যই মুমিনের অস্ত্র ও সফলতার চাবিকাঠি

কিন্তু আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আম্বিয়ায়ে কেরামের যে জীবনাদর্শ উপস্থাপন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের যে করুণ পরিণতির কথা বলেছেন তা আমাদের এই বস্তুকেন্দ্রিক ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র রচনায় কয়েকটি উজ্জ্বল নমুনা মাত্র পত্রস্থ করেছি– যার প্রতিটিই বস্তুকেন্দ্রিক এই মানসিকতার প্রচণ্ড বিরোধী। বরং পবিত্র কুরআনে এসব বাণী দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথাই ঘোষণা করে সফলতার মূল চাবিকাঠি হল ঈমান ও আনুগত্য। ঈমান ও আনুগত্যের বলেই যুগে যুগে নবীগণ সফল হয়েছেন। তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল পার্থিব সহায়-শক্তিহীন মুমিনদের অসহায় কাফেলা বিশাল শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। পৃথিবীর ইমামত নেতৃত্ব ও দিক দর্শনের সুউচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে–

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ط وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۝

'আর আমি তাদেরই মধ্য থেকে ইমাম বানিয়েছি- যারা আমার আদেশ মাফিক মানুষকে পথ দেখায়। কারণ, তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং আমার নির্দেশনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। [আলিফ-লাম-মীম-সিজদা : ২৪]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

আমি মূসা (আ.) এবং তদীয় ভাইকে এ মর্মে ওহী করেছি, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়কে মিসরে আবাস দাও। তোমাদের ঘরগুলোকে মসজিদ বানাও। নামায কায়েম কর আর মুমিনদেরকে শুভ সংবাদ দাও। [ইউনুস : ৮৭]

আরও ইরশাদ হচ্ছে-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে অবিচল রাখবেন। [মুহাম্মদ : ৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন-

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا اِلَى السَّلْمِ ق وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ق وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝

তোমরা হতবল হয়ো না। তোমরা (মানুষকে) নিরাপত্তার প্রতি আহ্বান করতে থাক, অতঃপর তোমরাই বিজয়ী হবে- আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। আর তিনি তোমাদের আমলে কোন ঘাটতি করবেন না। [মুহাম্মদ : ৩৫]

সারকথা হলো, নবী-রাসূলগণের সমগ্র জীবনাদর্শের একটাই পয়গাম, আল্লাহর সত্তা ও নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস, নিখুঁত সত্য ঈমান আর নেক আমল, তাঁর প্রতিটি আদেশের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। তাঁদের পবিত্র বিধৌত জীবন জুড়ে এরই স্বচ্ছ চিত্রায়ণ ঘটেছে যুগে যুগে। সকল যুগের সকল নবীর পথ ছিল শুধু এটাই। আর তাঁদের সকলের সেই পবিত্র জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ হেফাজত করেছে আল-কুরআন।

অসহায় দুর্বল শক্তিহীন যে কোনো জাতির জন্যে একমাত্র আশার আলো এটা। যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, আল্লাহর পথের যারা আহ্বানকারী তাদের সকল ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এরই উপর। এই বিশ্বাস নিয়েই এগুতে হবে- বস্তু নয়; যান্ত্রিক দর্প-দাপট নয়; পারমাণবিক অস্ত্র নয়; সফলতার মূলশক্তি ঈমান ও আল্লাহর হুকুমের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। নিশ্চয়ই আল্লাহই সত্য, তিনি সর্বদাই সত্য বলেন এবং সঠিক পথের সন্ধান দেন।

স মা প্ত

--০--